চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীকান্ত : আত্মজীবনীর উপন্যাসায়ন

আত্মজীবনী এবং জীবনীর অন্তর্বস্তু ও প্রকরণের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম আন্তঃসম্পর্ক যে আছে তা অনস্বীকার্য। কারণ আত্মজীবনী এবং জীবনীকে কোনো বিশিষ্ট একক ব্যক্তিসত্তার পুনরাবিষ্কারের ইতিহাস বলা যায়। বিগত জীবন ও বর্তমান জীবনের ব্যবধানে তার হয়ে ওঠা, আত্মনিরীক্ষণ ও স্বীকারোক্তিমূলক রচনা এটা। যদিও সেখানে অপ্রকাশ্য অনেক স্পর্শকাতর দিক থেকেও যেতে পারে। বিশেষত আত্মজীবনীতে লেখকের প্রত্যক্ষ বাচনে নিজের কাহিনিই মুখ্য হয়ে ওঠে। আর জীবনী হচ্ছে পরোক্ষ বাচনে বিশিষ্ট কোনো ব্যক্তি-সত্তার জীবন-কাহিনির প্রকাশ। কিন্তু এক্ষেত্রে উপন্যাসের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা সম্পূর্ণতই আলাদা মাত্রা দাবি করে। সাধারণত উপন্যাস মানবজীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের প্রতিচ্ছবি। উপন্যাস মূলত জগৎ ও জীবনের প্রতিক্ষণের যাপন প্রক্রিয়ায় যে তাৎপর্য উদ্‌ঘাটিত হয় তারই প্রতিচ্ছবি। উপন্যাসের সংজ্ঞায়নে জনৈক সমালোচকের মন্তব্য এভাবেই ওঠে আসে —

> *''উপন্যাস এক বিশেষ শিল্পরূপ। ঔপন্যাসিক জীবন পারাপারের তীরে দাঁড়িয়ে অবলোকন করেন জগৎ ও জীবনকে। তারই প্রকাশ ঘটে উপন্যাসে।''*[১]

এই জগৎ, দেশ-কাল, সমাজের জনজীবনের সার্বিক রূপকে ধারণ করেছে নিজের অতলান্তে। এরই চক্রাকার ঘূর্ণাবর্তে চলতে চলতে জীবন-অভিযাত্রী লেখক পরোক্ষ বাচনে তুলে ধরেন বিস্তৃত জীবনের অভিজ্ঞতা ও আত্মদর্শনকে। যেখানে শুধু একক ব্যক্তিসত্তার আত্মিক জীবনই নয়, তার অভিজ্ঞতায়, দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয় বিভিন্ন সমাজ ও তার সমসাময়িক অবস্থান। পরিবর্তনশীল সময়ের অত্যাধুনিক মনন-মনস্কতায় নতুন নতুন আবিষ্কার, সৃষ্টি ও সাহিত্য রচনার বিষয়বিন্যাসেও প্রভাব ফেলেছে তা স্বাভাবিক। তার ফলে উপন্যাসও নতুন অন্তর্বস্তুতে ও প্রকরণে বিশেষত্ব অর্জন করেছে ও ভবিষ্যতেও এর যাত্রা অব্যাহত থাকবে।

সাহিত্যে তুলনামূলক বিচারে আত্মজীবনী ও উপন্যাস এই শাখাদুটোর প্রকৃতিগত রূপ, ধরন এবং

বৈশিষ্ট্য নিজের মধ্যে কিছুটা স্বতন্ত্রতা রক্ষা করে চলে। কিন্তু আত্মজীবনী এবং উপন্যাস এই দুটি শাখাকে যখন বিষয়ভিত্তিক শ্রেণিতে আত্মজৈবনিক উপন্যাস আখ্যা দেওয়া হয়; তখন তার প্রকৃতিগত রূপ ভাবগত ধারণা সবকিছুকে পাল্টে দেয়। আমাদের ভাবতে বাধ্য করে আত্মজীবনী ও উপন্যাস স্বভাবে, বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র হয়েও কীভাবে প্রচ্ছন্নভাবে নিজের মধ্যে গড়ে তোলে একটি নতুন বন্ধন ও নতুন আদল। এই বন্ধনী তৈরি হয় বাস্তব উপাদান ও কল্পনার সংযোজনে এই দুয়ের দ্বিরালাপের রসায়ন প্রক্রিয়ায় একটি নতুন রূপ লাভ করে। বাস্তব উপাদান, কল্পনার সংযোজন, লেখকের জীবনদর্শন অবশ্যই সব সাহিত্যেই কাম্য। কিন্তু কিছু রচনায় তাঁর জীবনের বিশেষ মুহূর্ত, ঘটনা, বাস্তব উপাদানসম্পন্ন অভিজ্ঞতা সাহিত্য রচনায় ইন্ধনের যোগান দেয়। সেখানেই আত্মজীবনী ও উপন্যাসের মেলবন্ধন গড়ে ওঠে। জীবনের বাস্তব উপাদানে কল্পনার রঙিন মোড়ক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য হলেও তাকে সাহিত্যিক ও নান্দনিক মর্যাদায় উত্তীর্ণ করতে ভাবরসের সাযুজ্য অত্যাবশ্যক। এই ভাবরস সৃষ্টির জন্যই কল্পনার সংযোজন দরকার। যেখানে বাস্তবের বিশেষ ঘটনাগুলো গৃহীত হয় কিন্তু অবাস্তব ও অনাবশ্যক প্রাত্যহিক ঘটনার বর্জন অবশ্যম্ভাবী।প্রতিবেদনকে সুগঠিত করতে কল্পনা ও ভাবরসের সংযোজন জরুরি। ঘটনা ও অভিজ্ঞতার গ্রহণ-বর্জন ও সংযোজনে নতুনভাবে বিশুদ্ধিকরণের (Filtering) মাধ্যমে ঔপন্যাসিক প্রতিবেদনের পরিশীলিত রূপসমূহ প্রস্তুত হয়। এভাবেই আত্মজীবনের উপাদান প্রস্তুত হয় উপন্যাসায়নের জন্য (Novelisation)।

Novelisation বা বাংলায় উপন্যাসায়ন শব্দটির তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার উদ্ভাবক বাখতিন। জগৎ ও জীবনে বিশেষ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলতেই থাকে। জগৎ-এ জীবজগৎ, মানবজীবন, বিজ্ঞান প্রভৃতির একটি আন্তঃসম্পর্ক বিদ্যমান। এই সমস্ত কিছুকে অবলম্বন করে বিশেষ অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি, অনুভূতির জারক রসে বাস্তব জীবনকে লেখনীর মাধ্যমে ধারণ করা হয়; তখনই তা উপন্যাসের মর্যাদা পায়। বিশেষ বিশেষ জ্ঞান আহরণ করে আজকের অত্যাধুনিক সময়ে যান্ত্রিক অনেক কিছুই সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু স্পর্শকাতর, মানবিক, সামাজিক সমস্যাকে, সময়ের ইতিহাসকে বহন করার একমাত্র অস্ত্র আজও এই সাহিত্যই। 'চর্যাপদ' রচিত না হলে আদিকালের ইতিহাস আমাদের কাছে অধরাই থেকে যেত। মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যগুলোর কবি পরিচিতি বা বিষয়বস্তুর বিন্যাসে স্পষ্ট হয় তৎকালীন সমাজব্যবস্থার রূপ। প্রবহমান সময়ে পরিবর্তিত জগৎ ও জীবনের পারিপার্শ্বিক সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিভিন্ন প্রসঙ্গকে (Theme) কেন্দ্র করে বাস্তব তথ্য ও কল্পনার সংমিশ্রণে সঞ্চিত অভিজ্ঞতাপুঞ্জ ঔপন্যাসিকতার মর্যাদা লাভ করে। এই ক্ষেত্রে

আলোচকের একটি সূত্র প্রযোজ্য—

"যে প্রক্রিয়ায় জীবন ও জগতের অভিজ্ঞতাপুঞ্জ উপন্যাস হয়ে ওঠে, এর তাৎপর্য কত অনেকান্তিক — তা এই পারিভাষিক শব্দের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে।"[২]

চাক্ষুষ দর্শনে উদ্ভাসিত অনেক কিছু আমাদের অন্তঃস্থলে জমে থাকে। জীবনের বিভিন্ন ঘাতে-প্রতিঘাতে এই দর্শনগুলি অভিজ্ঞতায় বিশেষভাবে দীপ্যমান হয়ে ওঠে। ঔপন্যাসিক জগৎ, জীবন ও সমাজের পারিপার্শ্বিক প্রক্রিয়ায় জাত এই অভিজ্ঞতাপুঞ্জের মূল নির্যাসটুকুকে সাহিত্যের উপাদানরূপে গ্রহণ করেন। প্রত্যেকটি জীবন যেহেতু সামাজিক অন্তর্বলয়ে বাস করে; তাই জীবনের চলা কখনও একরৈখিক হতে পারে না। একটি সত্তার বিপ্রতীপে অপর সত্তার উপস্থিতি কাম্য। কারণ জীবন এককভাবে পূর্ণ হয় না। দ্বিবাচনিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে একটি সত্তা সামাজিক অস্তিত্বের সঙ্গে একাত্ম হয়। এই একাত্মতার ফলে বহুমুখিন সংস্রবে ব্যক্তিজীবন সমষ্টিতে পূর্ণতা পায়। এর ফলে গড়ে ওঠে একক সত্তার সঙ্গে অপর সত্তার দ্বিবাচনিক সম্পর্ক। উপন্যাস যেহেতু জীবনেরই প্রতিরূপ, তার ফলে জীবনের পাঠ রূপ পায় ঔপন্যাসিক প্রতিবেদনে। কেউ এককভাবে কখনও স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। অপর সত্তার সমাবেশে তা দ্বিবাচনিক সত্যে উপনীত হয়। আর তাই বাখতিনের মতে প্রতিটি উচ্চারণই আসলে সামাজিক উচ্চারণ।

বাখতিন মূলত বলতে চেয়েছিলেন যে 'Novelness' অর্থাৎ উপন্যাসত্ব, যার মুখ্য আধার জীবন। যেখানে রয়েছে সত্তা এবং অপরতার উপস্থিতি। কেন্দ্রীয় (centred) এক অস্তিত্বের বৃত্তাকার পরিমণ্ডলে থাকে অসংখ্য অপর অস্তিত্ব। যার ফলে দ্বিবাচনিক প্রক্রিয়ার সঞ্চালক গতি অব্যাহত থাকে এবং ছড়ানো, ছিটানো, খণ্ডিত অজস্র সত্তা-প্রতিসত্তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলতে থাকে। যার নির্দিষ্ট কোনো পরিসমাপ্তি নেই। যেহেতু উপন্যাসত্বের মূল আধার জগৎ ও জীবন। জীবন তো এই জগতের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাই জগৎ ও জীবনের মধ্যে ভারসাম্যে সমান্তরালতা রক্ষা করে চলতে হয়। জগতেও সময়ের পরিবর্তনের ফলে ঘটে রীতিনীতির পরিবর্তন। যথার্থ সাহিত্যিক প্রতিবেদন যেহেতু দ্বিবাচনিক এবং তাতে সামগ্রিকতার রূপ পরিস্ফুট করে। তাই জীবনের ও উপন্যাসের তাৎপর্য প্রতিষ্ঠিত হয় অনেকার্থদ্যোতনায়। সমালোচকের মন্তব্যে স্পষ্ট হয় যে—

"উপন্যাসীকরণ জীবন ও শিল্পের মেলবন্ধনের চিহ্নায়ক; এ শুধুমাত্র কাহিনি ও কুশীলবদের মনোরঞ্জক বা ইচ্ছাপূরক গ্রন্থনার ইঙ্গিত নয়। ব্যক্তিকে সামাজিক

স্বরে অন্বিত করার দায় যে পালন করে উপন্যাস; তাতে এই নভেলাইজেশনের ভূমিকাই প্রমাণিত। এর মধ্য দিয়ে উপন্যাস এই বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে আমাদের কাছে ঞ্ব প্রতিটি সম্পর্কই সামাজিক সম্পর্ক এবং প্রতিটি উচ্চারণই সামাজিক উচ্চারণ। অর্থাৎ উপন্যাসীকরণ মানে খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি-অস্তিত্ব ও একক মুহূর্তগুলির অন্বয় সাধন ও সামাজিকীকরণ।"[৩]

তিনি আরও জানান —

"অতএব ভাবনাময় পুনর্নবায়নের মধ্য দিয়ে তাৎপর্য-সন্ধানের দ্বিবাচনিকতা প্রমাণিত হচ্ছে বলে, উপন্যাসীকরণও হয়ে উঠেছে অনেক অর্থাৎ বহুরৈখিক, বহুমাত্রিক ও বহুবাচনিক। তাহলে জীবনের মতো উপন্যাস নামক শিল্প-মাধ্যমেও সব মুহূর্তেই নতুন সূচনার মাহেন্দ্রক্ষণ।"[৪]

প্রাথমিকভাবে 'Novelisation' বা উপন্যাসায়ন বিষয়টির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়।

(১) উপন্যাসীকরণের মধ্যে থাকে জীবন ও শিল্পের মেলবন্ধন।

(২) উপন্যাসীকরণ প্রক্রিয়ার মূল ভাববীজ নিহিত চিহ্নায়কের সামাজিক বহুস্বরিকতায়।

(৩) উপন্যাস বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি। কিন্তু বাস্তব ঘটনার হুবহু 'photocopy' নয় বা অনুকরণও নয়। বাস্তবের আধারিত বিষয়বস্তুতে লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, অনুভূতি, উপলব্ধি এবং সাহিত্যের প্রাথমিক শর্ত রক্ষার জন্য কিছুটা গ্রহণ বর্জনের মাধ্যমে কল্পনাশ্রয়ী হতে হয়। কারণ কল্পনা ছাড়া উপন্যাসীকরণ সম্ভব নয়। সাহিত্যের নান্দনিকতার খাতিরে কিছুটা গ্রহণ-বর্জন করতেই হয় লেখককে।

(৪) উপন্যাসায়ন প্রক্রিয়ায় অথবা আমরা আরও দেখি অনুবাদ সাহিত্যের ক্ষেত্রে গ্রহণ-বর্জন, পরিমার্জন এবং সংযোজনের একটি মাজা-ঘষা রূপ। অর্থাৎ লেখক-জীবনের মূল কিছু ঘটনাকে উপাদান রূপে গ্রহণ করেন। প্রাত্যহিক একঘেয়েমিমূলক জীবনধারা অবান্তর বিবরণকে বর্জন করে চলে। নিরেট গল্প বুননের খাতিরে কিছু চরিত্র, ঘটনা, পরিবেশের নতুন সংযোজনও ঘটিয়ে থাকেন। সাহিত্যে ভাবরস ও কল্পনার সাযুজ্যে তাকে স্নিগ্ধ

সাবলীল প্রাণবন্ত করে তোলেন। গঠনে, ভাষায়, শৈলীতে পরিমার্জনার ফলে নান্দনিক সৌন্দর্য ফুটে তাঁর সৃষ্টিকে স্বতন্ত্র রূপ দান করে।

(৫) বাখতিন Novelisation এর মূল আধার রূপে চিহ্নিত করেছেন জীবনের রূপান্তরিত আধারকে। তাই যখনই বাস্তব জীবনকে আমরা যেভাবে যাপন করি তখনই তা অনুভবে, উপলব্ধিতে, অভিজ্ঞতায় কল্পনার অঙ্গসজ্জায় সাহিত্য হয়ে ওঠে। বাস্তব ঘটনাকে ভাষায় বোঝাতে হলে বর্ণনার সময় কথকের ব্যাখ্যায় তা রূপান্তরিত হতে বাধ্য। এটাই সাহিত্যের সত্য।

(৬) লেখক নিজের বুদ্ধি-যুক্তি চেতনা দিয়ে বহির্বাস্তবকে পর্যবেক্ষণ করে অন্তর্লীন বিশুদ্ধীকরণের (Filtering) মাধ্যমে অভিজ্ঞতালব্ধ মূল নির্যাসটুকুই তুলে ধরেন তাঁর পরোক্ষ বাচনে। উপন্যাসীকরণ পদ্ধতিতেও তাই ঘটে।

উপন্যাসায়ন প্রক্রিয়া বা তাত্ত্বিক ধারণাটি খুব সুন্দরভাবে কার্যকর হয়েছে শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে। 'শ্রীকান্ত' শরৎ সাহিত্যের অন্যতম নিদর্শন। শ্রীকান্ত উপন্যাসকে শরৎচন্দ্রের জীবনভাষ্য বলা যায়। এই উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিসত্তার সূক্ষ্ম নিবিড়তম প্রকাশ ঘটেছে। অন্যদিকে শিল্পীসত্তারও বিকাশ ঘটেছে। বাংলা সাহিত্যের ধারায় শরৎচন্দ্রই প্রথম আত্মজীবনের ভাষ্যকে তুলে ধরলেন ঔপন্যাসিক প্রক্রিয়ায়। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে চারটি পর্ব। প্রথমপর্বের সূচনায় আমরা দেখি লেখা রয়েছে—

> *"আমার এই ভবঘুরে জীবনের অপরাহ্ন বেলায় দাঁড়াইয়া ইহারই একটা অধ্যায়*
> *বলিতে বসিয়া আজ কত কথাই না মনে পড়িতেছে।"*[৫]

উপন্যাসের আরম্ভেই তাঁর ব্যাপ্ত বিষয়বিন্যাস ও রচনাশৈলীর প্রকরণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এটা আসলে আত্মজীবনের উপাদানে, অভিজ্ঞতায়, উপলব্ধিতে ও জীবনসত্যের মূল্যবোধে গড়ে ওঠা নিরেট ঔপন্যাসিক প্রতিবেদন। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাস রচনার ইতিহাস প্রসঙ্গটি তুলে ধরলেই তার মূল বিষয়বস্তু উদ্ভাসিত হবে। প্রবাসে থাকাকালীন শরৎচন্দ্র 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় দুই-একজন খ্যাতনামা ব্যক্তির ভ্রমণকথা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে দেখেছিলেন। ভ্রমণকাহিনিগুলি ছিল দেবীপ্রসাদ সর্বাধিকারীর 'য়ুরোপে তিনমাস' এবং বর্ধমানের মহারাজ বিজয়ানন্দ মহাতাবের 'আমার য়ুরোপ ভ্রমণ'। এই ভ্রমণকাহিনিগুলির মধ্যের বস্তুনিষ্ঠ, বহির্জীবনের তথ্যনির্ভর এবং আত্মপ্রশংসার সস্তা প্রচারে শরৎচন্দ্রের ভাবুক শিল্পীমন

ব্যথিত হয়েছিল। কারণ সাহিত্যরচনা যা তাঁকে জীবনের দুঃখ-যন্ত্রণাকে সংবরণ করে সৃষ্টির মধ্যে আনন্দপথের সন্ধান দিয়েছে। সম্পাদককে চিঠি লিখে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশীল লেখক শরৎচন্দ্র তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন। এবং সচেতন লেখক নিজের ভ্রমণমূলক রচনা লেখায় আগ্রহ প্রকাশ করেন। হয়তো এটাই ছিল তাঁর আক্রমণাত্মক প্রতিবাদের ভাষা। তখন সচেতন শিল্পীর হাতে তাঁর অন্তর্লীন অনুভূতি ও দূরদর্শী পর্যবেক্ষণমূলক জীবনদর্শনে তা ভ্রমণকাহিনিকে অতিক্রম করে গেল। এবং তা হয়ে উঠল উপন্যাসের ধারায় নতুন আদলের উপন্যাস। 'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্ব ভারতবর্ষ পত্রিকায় 'শ্রীকান্ত শর্মা' ছদ্মনামে ভ্রমণকাহিনি রূপে প্রকাশিত হয়। কিন্তু স্বভাবজাত লেখকের রচনাতে তা শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠেছে শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। রচনাশৈলী ও বিষয়বিন্যাসের প্রকরণে নতুন মাত্রায় নতুন ধরনের লেখার যাত্রারম্ভের সূচনা ঘটে বাংলা সাহিত্যে। শরৎচন্দ্রের এই ধারণা সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্য তুলে ধরা যেতে পারে —

> *"ভ্রমণকাহিনিতে শুধু মানুষের বাইরের জীবন ও তার একটানা বস্তুনির্ভর কাহিনিই থাকবে, এটা বোধহয় শরৎচন্দ্র মানতে চাইছিলেন না। ওই ধরনের ভ্রমণকাহিনি বর্ণনার প্রতিক্রিয়াতেই শরৎচন্দ্র নিজের জীবনের দিকে তাকিয়েছেন, জীবনের অন্তহীন পথ পরিক্রমায় (পরিক্রমার পরিধি ইউরোপ অবধি বিস্তৃত না হলেও) মানুষ কীভাবে প্রৌঢ়ত্ব হয়ে বার্ধক্যে এসে পৌঁছোয়, তাঁর অন্তর্জগতে কতো বিচিত্র অভিজ্ঞতার ছাপ পড়ে, তাঁর অন্তরের শিশুটি অভিজ্ঞতার ঘাটে ঘাটে ঘুরে কীভাবে যৌবন পায়, প্রৌঢ়তা পায়, বার্ধক্যের বিদগ্ধ প্রসন্নতায় পৌঁছোয়, তাকেই লক্ষ্য করবার চেষ্টা করেছেন। কাজেই শ্রীকান্ত যদি 'Partly a travel Diary' হয়, তবে সে ভ্রমণের ইতিহাস লোক-লশকর, গাড়ি পালকি নিয়ে চলবার ইতিহাস নয়, স্থান ও পরিবেশের বাহ্যিক বর্ণনা নয়, মানুষের সঙ্গে সামাজিক আলাপের, কান্না-হাসির বর্ণনাও নয়। শ্রীকান্ত হল নিজের অন্তর্লোক-আবিষ্কারের কাহিনি; এর মূল প্রেরণা মানব সন্ধানের প্রেরণা।"*[৬]

শ্রীকান্ত উপন্যাসের প্রথম পর্বে শ্রীকান্তের জবানিতে শরৎচন্দ্রের ভাষ্য—

> *"ভ্রমণ করা এক, তাহা প্রকাশ করা আর। যাহার পা দুটা আছে, সেই ভ্রমণ*

করিতে পারে; কিন্তু হাত দুটা থাকিলেই ত আর লেখা যায় না। সে যে ভারি শক্ত।"[৭]

অর্থাৎ এখান থেকেই আমরা বুঝে নিতে পারি যে, শরৎচন্দ্র একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই 'শ্রীকান্ত' রচনায় হাত দিয়েছিলেন। একজন ভবঘুরে, ভ্রমণপিপাসু বিবাগী জিজ্ঞাসু মনের অধিকারী এখানে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। নিজের জীবনকে আধার করে আরো বহু জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতময়, সমস্যাসংকুল জীবনকে তুলে ধরেছেন। শরৎচন্দ্র আত্মজীবনকে আধার করেও তার মধ্যে ঘটিয়েছেন উপন্যাসের সংযোজন। তাঁর মূল অভিপ্রায় ছিল হয়তো বিস্তৃত পথ পরিক্রমায় আহরিত বিভিন্ন ছড়ানো, ছিটানো, খণ্ডিত জীবনগুলোকে কাহিনির আকারে ধারণ করা। যা আত্মজীবনীতে কখনো সম্ভব হত না। কারণ তিনি তাঁর জীবনের সংস্পর্শে আসা ছোট বড় সব ঘটনাকে তাৎক্ষণিকভাবে হলেও সমানভাবে হৃদয়ংগম করে উপস্থাপিত করেছেন। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে দেখা যায়, ছোট বড় সব চরিত্রই একেবারে গৌণ হয়ে পড়েনি বা শ্রীকান্তও খুব মুখ্য হয়ে ওঠেনি। মুখ্য চরিত্র শ্রীকান্তের পাশাপাশি সমান্তরাল অবস্থানে চলেছে অপর অস্তিত্বগুলো। তার চেয়েও বড় কথা শ্রীকান্তের আড়ালে শরৎচন্দ্র যাদের জীবনকাহিনি বিবৃত করে গিয়েছেন তারা শুধু গল্পরূপে নয়। তাদের সঙ্গে শ্রীকান্তের রয়েছে প্রত্যক্ষ সংশ্রব, আত্মিক সম্পর্ক। তারা প্রত্যেকেই কোনো না কোনো ভাবে শ্রীকান্তকে আপন করে নিয়েছে। শ্রীকান্তও সুখ-দুঃখে তাদের একান্তরূপে পাশে পেয়েছে।

শ্রীকান্তের ভবঘুরে জীবনের পুঞ্জীভূত অভিজ্ঞতা এবং সুখ-দুঃখ, প্রেম, প্রত্যয়গুলিকে শরৎচন্দ্র গভীরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। উপন্যাসের পরিমণ্ডলে ভিড় করেছে অসংখ্য নরনারী। উপন্যাসের কাহিনি হয়ে উঠেছে বৈচিত্রমণ্ডিত। 'শ্রীকান্ত' পরিণত বয়সে স্মৃতিচারণার মাধ্যমে বিগত দিনের জীবনের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির কথা বলেছেন। এই বৈচিত্রময় জীবনপথের সঙ্গী-সাথীদের কথা বলেছেন অত্যন্ত সহানুভূতি দিয়ে। শৈশবে শ্রীকান্তের দীক্ষা হয়েছে দুজন নিঃস্বার্থ নর-নারীর কাছে। বন্ধু ইন্দ্রনাথ যার কাছে দুঃসাহসিকতা, নিঃস্বার্থ বন্ধুত্ব, পরদুঃখকাতরতা ও পরোপকারের দীক্ষা নিয়েছে। আর অন্নদাদিদির স্নেহমণ্ডিত কল্যাণকামী শক্তির রূপদর্শনের সাথে নিঃস্বার্থ ভালবাসার উপলব্ধি ঘটে। পরবর্তী জীবনে যা শ্রীকান্তের পাথেয় হয়েছে। রাজলক্ষ্মীর কাছে সে জীবনের চরম প্রাপ্তি লাভ করেছে। বড় প্রেমের আসল রূপ যা শুধু কাছেই টানে না, কখনো ভালবাসার পাত্রের মঙ্গলার্থে দূরেও ঠেলে দেয়। সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার 'শ্রীকান্ত'

উপন্যাসের আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন—

> *"প্রত্যেক মানুষেরই একটা আত্মজীবন আছে ভিতরকার ব্যক্তি-মানুষের একটা পৃথক পরিচয় আছে; কিন্তু সে পরিচয় দুই কারণে অজ্ঞাত থাকিয়া যায়। প্রথমতঃ প্রায় সকল ক্ষেত্রেই তথা সাধারণ মনস্তত্ত্বঘটিত একটা ব্যাপার; তাহার ব্যক্তিটা স্বতন্ত্র হইলেও খুব বিশিষ্ট নয়— তেমন বৈশিষ্ট্যকেও মনোবিজ্ঞানের কয়েকটি তত্ত্বের অধীন করিয়া ব্যাখ্যা করা যায়— তাহাতেই রহস্যের সমাধান হয়। দ্বিতীয়তঃ যেখানে তাহা সাধারণের একটু উপরে উঠিয়া থাকে, সেখানে হয়ত ব্যক্তির সেই আত্মজীবনের বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্য তাহার নিজের নিকটেও তেমন সুস্পষ্ট নয়— আপনাকে আপনি দেখার মত দৃষ্টি তাহার নাই; তারও কারণ— সেই অনুভূতিও তেমন গভীর বা তেমন স্বতন্ত্র নয় যাহাতে সে নিজেও চমৎকৃত হয়। আবার শুধু চমৎকৃত হইলেই হইবে না; সেই অনুভূতিকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করার মত প্রকাশ শক্তিও চাই— এই শক্তিই কবি শক্তি, ... সেই শক্তি এখানে নিযুক্ত হইয়াছে কবি ব্যক্তির যে নিজস্ব জীবন কোন ভাববস্তু নয়— তাহাকেই বাণীরূপ দান করিতে। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে আমি এইরূপ একটি আত্মজীবনকথা পাঠ করিলাম।"*[৮]

আত্মজীবনকে উপন্যাসে রূপ দেওয়ার ভাবনা শরৎচন্দ্রের মধ্যেই প্রথম দেখা গেল। 'শ্রীকান্ত' শরৎচন্দ্র নন। শ্রীকান্ত একটি বাস্তব এবং কল্পনায় মেশানো সাহিত্যিক চরিত্র। অনেক সমালোচকগণ 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসকে বিশেষভাবে প্রথম খণ্ডকে আত্মজীবনীমূলক বলে অভিহিত করেছেন। অনেকেই বলেছেন 'শ্রীকান্ত'-র দুটি ভাগ, প্রথমটি আত্মজীবন এবং দ্বিতীয়টি আত্মচিন্তা। এই উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিজীবনের অনেক ছাপ লক্ষ করা যায়। শরৎচন্দ্র তাঁর অভিজ্ঞতা, আত্মবিশ্বাস এবং জীবন পরিক্রমায় আহরিত একান্ত অভিজ্ঞতা ও প্রত্যয়গুলোকে 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে উজাড় করে দিয়েছেন বলা যায়। তাই বলে শ্রীকান্ত আত্মজীবনী নয়, আত্মজীবনের উপাদান বিশিষ্ট ভাবনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় সংগঠিত উপন্যাস। অর্ধেক কল্পনা, অর্ধেক বাস্তবে, মনের মাধুরী মিশ্রিত রচনা এটা। 'শ্রীকান্ত' তাঁর সামগ্রিক জীবন অভিজ্ঞতার তাৎপর্য ও জীবনদর্শনেরই উপলব্ধ সাহিত্যিক প্রতিবেদন। প্রথম পর্বে শ্রীকান্তের বাল্যজীবনের কিছুটা মিল

রয়েছে কাহিনির গ্রন্থনায়। কিন্তু পরবর্তী পর্বগুলোতে শরৎচন্দ্র সম্পূর্ণ আত্মগোপন করেছেন। শরৎচন্দ্র এবং শ্রীকান্তের মধ্যে স্বভাবগত মিল আছে। কিন্তু তাদের জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর মিল সেই অর্থে নেই।

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে শরৎচন্দ্র তাঁর বিস্তৃত জীবনের ঘটনাগুলোকে সাজাননি। তিনি জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতা, বিশ্বাসের একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছেন। এই উপন্যাসের নিবিড় পাঠে স্পষ্ট হয় শরৎচন্দ্রের আত্মজিজ্ঞাসা যা একজন সূক্ষ্ম সমাজ-পর্যবেক্ষকের দ্বারাই সম্ভব। এখানে তিনি তাঁর বিগত জীবনের কাহিনি বলতে বসেননি। দীর্ঘ জীবনের পরিক্রমায় কাঙ্ক্ষিত, অনাকাঙ্ক্ষিত বিভিন্ন ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন। সেই ঘটনাগুলোতে সমাজের গোঁড়ামি, নির্দয়তা তাঁকে ব্যথিত করেছে। আর এই বেদনা থেকেই মনের গভীরে জমে উঠেছে জিজ্ঞাসা। আর এই জিজ্ঞাসারই এক একটি পর্যায় ছড়ানো-ছিটানো বিক্ষিপ্ত মানুষের জীবনের ঘটনাগুলো।

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের প্রথম পর্বেই কিছুটা অংশে শরৎচন্দ্রের প্রত্যক্ষ জীবনের পরিচয় আছে। কিন্তু চারটি পর্বের সামগ্রিক উপন্যাসে বাহ্যিক বাস্তব জীবন অপেক্ষা শরৎচন্দ্রের বাস্তব অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি মিশ্রিত মানসিক অভিব্যক্তির দিকটিই প্রবলভাবে ধরা পড়েছে। শ্রীকান্ত আসলে শরৎচন্দ্রের মানসচরিত্র। শ্রীকান্তের আড়ালে তিনি নিজের জীবনদর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। 'শ্রীকান্তে' আংশিকভাবে রয়েছে শরৎচন্দ্রের আত্মজীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু বাস্তব। অন্যদিকে সামগ্রিক জীবনের অভিজ্ঞতা ও ভাবাদর্শ উপন্যাস রূপে 'শ্রীকান্ত'-এ তার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে।

বিশিষ্ট সমালোচকগণ 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসকে আত্মজৈবনিক উপন্যাস রূপেই বিচার করেছেন। শরৎগবেষক ড. অজিত কুমার ঘোষ 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসকে 'David Copperfield' এবং 'Robinson Crusoe' এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। মোহিতলাল মজুমদার 'শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে তিনি একটি আত্মজীবনী পাঠ করেছেন শ্রীকান্তের মধ্যে। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসকে বাস্তব জীবনের সঙ্গে মেলাতে গিয়ে 'শরৎ পরিচয়' গ্রন্থে শরৎচন্দ্রের মামা সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন যে, ক্যাম্বিসের খাটের উপর শুয়ে থাকা পিসেমশাই আসলে শরৎচন্দ্রের দাদামশাই এবং রামকমল ভট্টাচার্য হলেন রামচন্দ্র ভট্টাচার্য। ছোড়দা, যতীনদা, তাঁর দুই মামা। বন্ধু ইন্দ্রনাথ রাজু উর্ফ রাজেন্দ্র নাথ এবং বাল্যপ্রণয়ী রাজলক্ষ্মী আসলে কাশীদাসী। এই বাস্তব চরিত্রগুলো আসলে ভাবে, রসে, সাহিত্যের খাতিরে পরিবর্তিত হয়েছে।

অনেকেই ভবঘুরে শরৎচন্দ্র এবং শ্রীকান্তের জীবনচর্যাকে মিশিয়ে ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন শরৎচন্দ্র এবং শ্রীকান্ত আসলে একাত্মা। শরৎচন্দ্র এবং শ্রীকান্তের মধ্যে স্বভাবগত ও প্রকৃতিগত অনেক মিল আছে। শরৎচন্দ্র এবং শ্রীকান্ত দুজনেই ভবঘুরে, ছন্নছাড়া, বাস্তবিক সংসার জীবনে উদাসীন। কিন্তু তারা পরোপকারী, পরদুঃখকাতর। সমাজে জাতপাত ধর্মের গোঁড়ামি ব্যথিত করেছে বাস্তবে শরৎ-হৃদয়কে। শ্রীকান্তের মধ্যে তিনি সেই বিরোধকে তুলে ধরেছেন। দুজনই সমাজের মধ্যে থেকেও, সমাজধর্মের খাতিরে ধর্মের শেকলে বাঁধা পড়েননি। প্রশ্ন তুলেছেন নিজের কাছে ও সমাজের কাছে। কিন্তু কাউকে আঘাত করেননি। শরৎচন্দ্র যেমন মানবদরদী, বিশেষত নারীদরদী, তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি শ্রীকান্ত চরিত্রও একই। আসলে 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে শ্রীকান্ত চরিত্রে লেখক তাঁরই গভীর জীবনদর্শনকে উদ্ভাসিত করেছেন। শ্রীকান্ত এবং শরৎচন্দ্রের জীবনের মধ্যে একটি সমান্তরালতা রয়েছে সূক্ষ্মভাবে। কিন্তু শরৎচন্দ্রের কিছু জীবন উপাদান ছাড়া শ্রীকান্ত সম্পূর্ণই একটি সাহিত্যিক চরিত্ররূপেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। সমালোচকের মন্তব্য এখানে গ্রহণযোগ্য—

> *"শ্রীকান্ত প্রথম পর্ব এক অর্থে শরৎচন্দ্রের আত্মকাহিনী হলেও অন্য অর্থে পুরোপুরি আত্মজীবনী নয়। এ হল উপন্যাস। উপন্যাসের জীবনদর্শন অবশ্যই আত্ম হবে।"*[৯]

শ্রীকান্ত আত্মজীবনী নয়। কিন্তু বিচিত্র ঘটনা সমাবেশে, উপাদানে, বাস্তব ও কল্পনার সংমিশ্রণে কীভাবে উপন্যাসীকরণ (Novelisation) ঘটেছে তার কিছুটা ব্যাখ্যার প্রয়োজন।

শরৎচন্দ্র প্রথমেই স্বীকারোক্তি করেছেন ভ্রমণকাহিনি লিখবেন। সেখানেই ইঙ্গিতটা পাওয়া যায়। ভ্রমণ তো বাস্তব-নির্ভর। কিন্তু এই ভ্রমণকাহিনি শরৎচন্দ্রের অলক্ষ্যে রচনাশৈলীর বৈচিত্রে অন্য পথে যাত্রা করে। তাই 'শ্রীকান্ত শর্মা' ছদ্মনামের আড়াল থেকে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বেরিয়ে এলেন। আর এই রচনার নাম হল শ্রীকান্ত। এই ভ্রমণকাহিনি ছিল একজন সমাজ-সচেতন সাহিত্যিকের। তখনই স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ আত্মজীবনীর উপাদানের পরিপূর্ণ ব্যাখ্যান। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও কল্পনার মিশ্রণ। ভ্রমণ তো কাল্পনিক হতে পারে না। বাস্তব জীবনের পথ-পরিক্রমা, বিভিন্ন জায়গার পরিচয় সাহিত্যের বাস্তবে রূপ নিতে গিয়ে কিছুটা রূপান্তর হয়েছে 'শ্রীকান্তে'।

আত্মজীবনী লেখকের আশৈশব থেকে পরিণত বয়সের জীবনের স্মৃতিকথা। শ্রীকান্ত উপন্যাসে তাঁর বাল্যকাল থেকে দীর্ঘ সাতাশ বছরের কাহিনি লিপিবদ্ধ। শ্রীকান্ত প্রথম পর্ব থেকে বা অখণ্ড শ্রীকান্তই

কিন্তু সরাসরি আত্মজীবনী নয়। এটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও কল্পনার দ্বিরালাপে গড়ে ওঠা ঔপন্যাসিক প্রতিবেদন। এখানে লেখক বা তাঁর প্রতিসত্তা শ্রীকান্ত আত্মপ্রচারে ব্যস্ত নন, এতে আত্মদর্শন মুখ্য স্থান লাভ করেছে। লেখক হুবহু জীবনের ছবি না এঁকে কল্পনার সংমিশ্রণে তুলে ধরেছেন বৃহৎ জীবনদর্শনকেই। শ্রীকান্তে অন্যান্য উপন্যাসের মতো কাহিনি এগিয়ে যায়নি। কথক শ্রীকান্তের অভিজ্ঞতায়, অনুভূতি এবং দৃষ্টি দিয়ে বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত, খণ্ডিত, বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে সংযোজিত করেছেন। কারণ বাস্তব জীবনে পূর্বধার্যভাবে কিছু ঘটে না। শ্রীকান্তের লেখক বা কথকেরও ভাষ্য তাই। —

> *"লিখিতে বসিয়া আশ্চর্য হইয়া ভাবি। এই সব এলোমেলো ঘটনা আমার মনের মধ্যে এমন পরিপাটিভাবে সাজাইয়া রাখিয়াছিল কে? যেমন করিয়া বলি, তেমন করিয়া তাহারা একটির পর একটি শৃঙ্খলিত হইয়া ঘটে নাই।"*[১০]

মোহিতলাল মজুমদার বলেছিলেন—

> *"এইরূপ আত্মকাহিনীও উপন্যাস হইয়া উঠে, তার কারণ, ইহার নায়ক একাধারে 'আত্ম'ও বটে, পরও বটে।"*[১১]

এখানে লেখক সূক্ষ্ম সমাজ-পর্যবেক্ষক। তাই তাকে আত্মকাহিনি লিখতে, আত্মপ্রচারে ব্যস্ত হতে দেখা যায় না। আত্মজীবনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি, সুখদুঃখে নিজের অস্তিত্বকে যেভাবে দেখেছেন অপর সত্তাগুলোকেও দিয়েছেন সমান গুরুত্ব। জীবনের মানে শুধু ব্যক্তিক উপস্থিতি নয় অপর সত্তার উপস্থিতিও কাম্য। দীর্ঘ জীবনের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতায় অর্জিত তাৎপর্য, সমাজের ব্যভিচার, বিভিন্ন জীবনসমস্যা শ্রীকান্তের আধার নির্মাণ করেছে। সাতাশ বছরের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ঝুলিতে সঞ্চিত বাস্তব উপাদানকেই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা শ্রীকান্তে উজাড় করেছেন লেখক।

মূল কথা জীবনের বৃহৎ এই অভিজ্ঞতাকে আত্মজীবনীতে তুলে ধরা সম্ভবপর নয়। তার জন্য লেখক উপন্যাস নামক শিল্প-মাধ্যমের আশ্রয় নিয়েছেন। আত্মজীবনীর আদলে তাঁর সাহিত্যিক প্রতিবেদনকে দণ্ডায়মান করেছেন। শ্রীকান্তে, শরৎচন্দ্র ও শ্রীকান্তের ছন্নছাড়া জীবনের একাত্মতায় সমান্তরালতায়, বিভিন্ন ঘটনার বাস্তব ও কল্পনার সংমিশ্রণে উপন্যাসীকরণ ঘটেছে। তা আত্মজীবনীও নয় বা শুধু উপন্যাস নয়। এটা আত্মজীবনের উপন্যাসায়ন। জীবনের সত্যকে, বিশ্বাসকে, অভিজ্ঞতাকে বৃহৎ পটভূমিতে উপন্যাসশিল্পের সত্যে রূপান্তরিত করেছে।

এই নিবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে আত্মজীবনীর উপকরণসমূহের কীভাবে উপন্যাসায়ন ঘটেছে তারই বিশ্লেষণ। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের বিস্তৃত আলোচনায় দেখা যায় শ্রীকান্ত কীভাবে ভবঘুরে হয়ে পড়েছিল তার বিবৃতিমূলক বর্ণনা। আসলে শ্রীকান্ত একজন ভবঘুরে সমাজ-সচেতন সাহিত্যিকের জীবনদর্শনে, জীবনের অভিজ্ঞতায় জীবনসত্যের আধারে গড়ে ওঠা মূল্যবোধের অভিব্যক্তি। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে নায়ক শ্রীকান্তের চরিত্রে সুদৃঢ় কোনও সংকল্প বা স্থিতাবস্থা নেই। সমস্ত কাহিনি জুড়ে রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্তের প্রেমের বন্ধন থাকলেও এটা স্থির নয়। শ্রীকান্তে যেন একজন ভ্রাম্যমান পর্যবেক্ষকের কথাই প্রধান। ঔপন্যাসিক শ্রীকান্তের সজ্ঞান ও অনুভূতিশীল দৃষ্টির মাধ্যমে উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রগুলোকে অনুধাবন করেছেন। বিচিত্র বিক্ষিপ্ত ছোটবড় ঘটনাগুলোকে ঐক্যসূত্রে গেঁথে চলেছেন। এখানে আছে বিভিন্ন সমাজ পরিবেশ, (পাটনা, বর্মা, বাংলাদেশের ছোট-বড় নানা গ্রাম শহর কলকাতা) সামাজিক নিয়ম-সংস্কারের প্রতিক্রিয়া। এবং এই সমাজের কোনায় কোনায় থাকা নানা মাপের নর-নারীর সংঘর্ষ ও চিত্তস্ফুরণই 'শ্রীকান্ত'-র বিষয়বস্তু।

তাহলে একটা দাবি অন্তত উঠে আসে সমাজজীবনের হাজারো খুঁটিনাটির সঙ্গে আত্মজীবনীর অংশটুকুর উপন্যাসায়ন কীভাবে ঘটেছে। এখানে কোন শরৎচন্দ্রকে খুঁজব আমরা। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে শ্রীকান্তকে অনেকেই শরৎচন্দ্রের আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস রূপে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু এখানে তো আমরা অনুমাননির্ভর কয়েকটি আত্মজীবনের উপাদান ছাড়া ব্যক্তি শরৎচন্দ্রের কোনও নির্দিষ্ট পরিচয় পাই না। শরৎচন্দ্র নিজেও কোনো জীবনী লেখেননি। যা কিছু অনুমান বন্ধু-বান্ধব বা কোনো সভা-সমিতিতে বক্তৃতা থেকে পাওয়া। শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিজীবনটাও ছিল রহস্যময়। কারণ বিবাগী মনের মানুষটি, শিরদাঁড়া খাড়া করার পূর্বে দুঃখদৈন্যে, আত্মীয়স্বজনের অবহেলায় কিছুটা বোহেমিয়ান স্বভাবে অনেক অনেক দিন উদ্দেশ্যহীন থাকতেন। তার বন্ধুরাও কোনও খোঁজ খবর পেতেন না। ভিত্তিহীনভাবে তার বিষয়ে অনেক সময় অনেক কুৎসাই রটনা করা হত। তাই এই ধরনের মানুষটির জীবনকাহিনি মেলানো কঠিন। তাহলে কীভাবে এটাতে আমরা আত্মজীবনের স্বরূপ সন্ধান করব। তাঁর জীবনের কয়েকটি তথ্যকে সামনে রেখেই এগোনো যেতে পারে।

লেখক দীর্ঘজীবনের এই প্রতিবেদন শেষ করেছেন জীবনের প্রান্তে এসে। শরৎচন্দ্র ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন উদাসীন ভবঘুরে। স্বভাব-বিবাগী, তাঁর সৃষ্ট শ্রীকান্তও ঠিক তেমন চরিত্র। এই উদাসী ভবঘুরে জীবন যেমন শরৎচন্দ্রের পুরো জীবন জুড়ে ছিল। শ্রীকান্তের মধ্যেও তাই ছিল। আবার কথক-নায়ক

শ্রীকান্তও অপরাহ্ন বেলায় বলতে বসেছে তার আত্মকথা। শরৎচন্দ্র শৈশবে পরাশ্রয়ীভাবে মাতুলালয়ে থেকে পড়াশোনা করতেন। শ্রীকান্ত উপন্যাসে শ্রীকান্ত পিসিমার বাড়িতে লালিত-পালিত। এক্ষেত্রে একটি উদ্ধৃতিতে বোঝা যায় —

> ''শ্রীকান্তের পাঠাভ্যাসের বিবরণ মামাবাড়ীতে শরৎচন্দ্রের পাঠাভ্যাসেরই অনুরূপ, শুধু কেবল কোন কোন চরিত্রের নাম এবং শ্রীকান্তের সহিত তাহার সম্বন্ধ বাস্তব সত্য হইতে একটু পরিবর্তিত করা হইয়াছে।''[১২]

এপ্রসঙ্গে অজিত কুমার ঘোষ 'শরৎ পরিচয় গ্রন্থে' সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের উদ্ধৃতি দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন যে —

> ''ক্যাম্বিসের খাটের উপর শুয়ে আছেন পিসেমশাই নয় দাদামশাই এবং বৃদ্ধ রামকমল ভট্টাচার্য — রামচন্দ্র ভট্টাচার্য। ছোড়দা এবং যতীনদা — দু'জনেই মামা — গল্পের খাতিরে দাদা হয়েছেন। এই সময় দেউড়িতে গৌরি সিং তুলসী দাসের রামায়ণ পড়ত সুর করে।
>
> উপন্যাসে টিকিট বিলির গল্প সত্য। ছিনাথ বহুরূপীর অভিযানও সত্য। তবে সবটাতেই কল্পনার রসান আছে। বহুরূপীর ল্যাজ কাটাটি শরৎচন্দ্রের অধিকন্তু ন দোষায়। সেদিন ইন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিল না। শরৎচন্দ্রও না। এই গল্প কুসুমকামিনীর সান্ধ্য বৈঠকে শোনা — শরৎচন্দ্র তাকে এমন অদ্ভুতভাবে রূপায়িত করেছেন এইখানে তাঁর কৃতিত্ব।''[১৩]

লেখক শরৎচন্দ্র নায়ক শ্রীকান্তের স্মৃতি-রোমন্থনে যেভাবে শোনা গল্পটির বর্ণনাপূর্বক বিশ্লেষণ করেছেন। এখানে আত্মজীবনের উপাদানকে শিল্পিত রূপ দিতে হলে যে গ্রহণ-বর্জন, পরিমার্জন ও সংযোজন প্রক্রিয়ার পরিশীলিত রূপের দক্ষতার প্রয়োজন হয় তাই গ্রহণ করেছেন সুষ্ঠুভাবে। যার ফলে শৈশবের একটি গোলমেলে পরিস্থিতিও হাস্যরস সৃষ্টির মাধ্যমে রসের উদ্রেক করে।

'শরৎ পরিচয়' গ্রন্থে সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন যে শ্রীকান্তের বন্ধু ইন্দ্র আসলে শরৎচন্দ্রের বন্ধু রাজু উর্ফ রাজেন্দ্রনাথ। এখানে বয়সের একটু অমিল আছে। কিন্তু রাজুর সাহচর্য, দুঃসাহসী ঘটনাবলী, পরিণতি সম্পূর্ণ সত্য। তাই বলে শরৎচন্দ্রও কম দুঃসাহসী ছিলেন না। শ্রীকান্তে যেভাবে নায়ক

নিজেকে অগোচরে রেখেছে ইন্দ্রনাথকে উজ্জ্বল করে, শরৎচন্দ্র তো ঠিক তেমন নয়। কিন্তু এই নেপথ্যের আড়াল তো তাকে নির্মাণ করতেই হত। তিনি নিজের আত্মপ্রকাশ নয় বরং নিজের জীবনের দর্শনে আহরিত পরিচিত ব্যক্তিজনকেই উদ্ভাসিত করতে তৎপর। শৈশবেই গান, বাজনা, যাত্রাদল, বাঁশী বাজানো ইত্যাদির প্রতি শরৎচন্দ্রের আগ্রহ ছিল। তাঁর গুরু ছিল রাজু। রাজু সম্পর্কে সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের উদ্ধৃতি —

> ''ইন্দ্রনাথের রাতে বাঁশী বাজিয়ে বেড়ানোর গল্প সত্য ... গোঁসাই বাগানে সেকালে ছিল রামবাবুর বাগান।' এবং রাজুর পরিণতি বিষয়ে তিনি বলেছেন — ''কিন্তু যৌবনেই তাহার সন্ন্যাস শুরু হইয়া গেল। তাহার মনে অদ্ভুত পরিবর্তন আসিল, বহির্জগৎ হইতে বিদায় লইয়া সে মনোজগতে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। গঙ্গার তীরে শিশুবনের কাছে একটা প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছের গায়ে নিজহাতে কাঠের ঘর বাঁধিয়া সে ধ্যাননিমগ্ন হইল। ...
>
> লোকে নানা কথা বলিতে লাগিল; তাহাতে কর্ণপাত না করায় ক্রমে সে মৌনী হইয়া পড়িল। অনশনে দিন কাটিত। বন্ধু-বান্ধব দূরে গেল। কেবল ভালবাসিত শিশুদের — কাছে পাইলে বুকে জড়াইয়া তৃপ্তির আনন্দে অবিরত কাঁদিত।
>
> একদিন সকলে দেখিল — 'পাখী উড়ে গেছে সাগর পারে।' সকল অনুসন্ধান ব্যর্থ করিয়া সে আজিও নিরুদ্দেশ।''[১৪]

শ্রীকান্ত উপন্যাসেও লেখকের বয়ানে ইন্দ্রের পরিণতি সম্পর্কে বন্ধু শ্রীকান্ত দুঃখ ও অনুশোচনা করেছে—

> ''আজ সে বাঁচিয়া আছে কিনা জানিনা। কারণ বহুবৎসর পূর্বে একদিন অতি প্রত্যুষে ঘরবাড়ি, বিষয়-আশয়, আত্মীয়-স্বজন সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সেই যে একবস্ত্রে সে সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, আর কখনও ফিরিয়া আসিল না। উঃ- সে দিনটা কি মনেই পড়ে।''[১৫]

সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন যে —

> ''শরৎচন্দ্র রাজুকে বাস্তবের ক্ষনিক অনিত্যতা হইতে সাহিত্যের চির-নিত্যতার

মধ্যে আনিয়া অমরত্ব দান করিতে যেটুকু রসযোজনার প্রয়োগ — তাহা পূর্ণভাবে করিয়াছেন।"[১৬]

রাজলক্ষ্মী বিষয়ে অনেকের ধারণা শরৎচন্দ্র দেবানন্দপুরে পাঠশালায় পড়ার সময় তাঁর একটি বাল্যসঙ্গিনী ছিল। সে যেমন শরৎচন্দ্রের খেলাধূলার সহচরী ছিল তেমনি কিশোর বয়সসুলভ শরৎচন্দ্রের উৎপাত, উপদ্রব সবই মুখ বুঁজে সহ্য করত। সে ছিল গ্রামেরই পাচক ব্রাহ্মণের কন্যা কালিদাসী। 'শ্রীকান্ত'-এর রাজলক্ষ্মীর মধ্যে বাল্যকালের যে স্মৃতির বর্ণনা রয়েছে সেখানেও একই বৃত্তান্ত পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু বাইজীরূপী রাজলক্ষ্মী হয়তো উপন্যাসের খাতিরে সংযোজিত। কারণ বোহেমিয়ান, নেশায় দক্ষ শরৎচন্দ্রের বাইজী বাড়িতেও নির্বাধে আসা যাওয়া ছিল। কিন্তু মনে হয় নারীদরদী, মানবদরদী শরৎচন্দ্র এই পতিতা নারীর মধ্যেও দেখেছিলেন সততা ও মানবতার রূপ। হয়তো কোনো বাইজীর রূপকল্পের সংযোজনেই তৈরি এই রাজলক্ষ্মী। এবং তার আদি-অন্ত যুক্ত সংমিশ্রণটি জীবন্ত করে তোলার জন্যই কৈশোরের বাল্যসঙ্গিনীর স্মৃতি অন্যতম রসদ হিসেবে কাজ করেছে। সংসারে পতিতা, নিগৃহীতা বাইজীরাও যে কত মানবিক গুণে সমৃদ্ধ, প্রেমময়ী এবং নীরবে আপন মনে তাপসী হতে পারে তারই সংযোজনে গড়ে উঠেছে রাজলক্ষ্মী চরিত্র।

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে রাজা কুমার বাহাদুরের পরিচয়ে 'শরৎচন্দ্রের জীবন রহস্য' গ্রন্থের রচয়িতা সৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়ও কিছু বর্ণনায় বলেছেন যে, মজঃফরপুরে থাকার সময় শরৎচন্দ্রের মহাদেব সাহু নামে একজন জমিদারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয় ইনিই হয়তো শ্রীকান্তের কুমার বাহাদুর। এখানেই কোনো বাইজীর সঙ্গে পরিচয় ঘটে।

শ্রীকান্তের বিভিন্ন সময়ে সন্ন্যাসী হওয়া, গৃহত্যাগ করে নিরুদ্দেশভাবে বেরিয়ে পড়া ঘটনার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের জীবনের বাস্তব মিল আছে। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে স্থান কালের সুনিপুণ মধুর বর্ণনায় যে ভাগলপুর, দেবানন্দপুর ও রেঙ্গুনের নাম করা হয়েছে সেখানে শরৎচন্দ্র বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত করেছেন। কৃষ্ণপুর গ্রামে রঘুনাথ গোস্বামীর আখড়া ছিল। শরৎচন্দ্র ছোটবেলা প্রায়ই সেখানে যেতেন। আর এই আখড়াই যে পরবর্তী সময়ে 'শ্রীকান্ত'-এ মুরারীপুর আখড়ায় পরিমার্জিত হয়ে রূপান্তরিত হয়েছে তা অনেকেই দাবি করেন। এবং কাঠগোড়ের বসু মল্লিক পরিবারের উল্লেখও করেছেন তৃতীয় খণ্ডে প্রথমে

"এমনই বসু মল্লিকদের গোপাল মন্দির হইতে আরতির কাঁসর-ঘণ্টার রব

অস্পষ্ট হইয়া বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল।"[১৭]

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে এভাবে আমরা শরৎচন্দ্রের গ্রামের বিভিন্ন বাস্তবের টুকরো ও বিক্ষিপ্ত পরিচয় পাই।

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে আমরা স্থান, কাল-পরিবেশে, উদাসীন স্বভাবে, কিছু চরিত্রের আংশিক পরিচিতিতে শরৎচন্দ্রের বাস্তব জীবনের তথ্য সম্বলিত উপাদান খুঁজে পাই। কিন্তু এই উপাদানগুলোর জন্যই তো তাকে আত্মজীবনীর অভিধায় ফেলা যায় না। এখানে লেখক শ্রীকান্তের জীবনবৃত্তান্ত খুব কমই লক্ষ করা যায়। তিনি উপরে উল্লিখিত কিছু কিছু ঘটনা জীবন থেকে গ্রহণ করেছেন সত্যি। বহির্জীবন তদপেক্ষা বর্জন করেছেন। শ্রীকান্তের শৈশবের পরিচয় আমরা পাই। কিন্তু সেটাও বন্ধু ইন্দ্র ও অন্নদাদিদি রূপী দুটি ব্যতিক্রমী মানবের সাহচর্যে তার মানসগঠনের দিকটি স্পষ্ট করার জন্য। তাঁর পিতা, মাতা, ভাই-বোন বিশিষ্ট পারিবারিক জীবন এখানে গৃহীত হয়নি। বা লেখক শরৎচন্দ্রের দৈন্যদশা, এই পরিস্থিতিতে কখনো ওঠে আসে নি।

এই উপন্যাসে শ্রীকান্ত অপরাহ্ন বেলায় ভবঘুরে জীবনের অধ্যায় বলতে বসেছে কিন্তু সে তো লেখক চরিত্র নয়। সে এক শিক্ষিত কুসংস্কার মুক্ত, মানবদরদী একজন বোহেমিয়ান অভিযাত্রী। শ্রীকান্তে শরৎচন্দ্রকে হুবহু খুঁজতে যাওয়া ধৃষ্টতার নামান্তর। কারণ শরৎচন্দ্র ছিলেন একজন লেখক। প্রথম জীবনে খ্যাতি না থাকলেও পরবর্তীকালে রেঙ্গুনে প্রবাসী জীবন থেকেই তাঁর সাহিত্যিক রূপে পথযাত্রার সূচনা হয়েছিল। শ্রীকান্তে এই জায়গাটাতেই তিনি সবচেয়ে বেশি আত্মগোপন করেছেন। একবারও তাঁর বহিরঙ্গ রূপের বর্ণনাকে ঘুণাক্ষরেও টের পাওয়া যায় না। তাদের অন্তর্মিলটাই শ্রীকান্ত ও শরৎচন্দ্রের সাযুজ্য। শরৎচন্দ্রও আত্মসচেতন, সংস্কারমুক্ত, শিক্ষিত কিন্তু স্বভাবে বোহেমিয়ান ভবঘুরে। তাহলে এখানেও তিনি জীবনের নানা অধ্যায়ের সংমিশ্রণে একটি অধ্যায় বলতে চেয়েছেন। অজিত কুমার ঘোষ যথাযথ বলেছেন —

"শ্রীকান্ত হইতে ভিন্ন হইয়া তিনি শ্রীকান্তের শৈল্পিক রূপ দিয়াছেন এবং
শ্রীকান্তের সহিত অভিন্ন হইয়া তিনি নিজেকে প্রকাশ করিয়াছেন।"[১৮]

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে কী ধরনের আত্মজীবনের উপাদানের ঔপন্যাসিক প্রক্রিয়া ঘটেছে তা আলোচনা করতে হলে শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিজীবন আলোচনা করা জরুরি। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে অধিক জায়গা জুড়ে রয়েছে নারীর জীবন। শরৎচন্দ্র সমাজে কলঙ্কিত নারীদের বহিরঙ্গের খোলস ভেদ করে তাদের অন্তরের পবিত্রতার রূপটিকে প্রস্ফুটিত করেছেন। সবাই আপন মহিমায় দীপ্তি লাভ করেছে। কিন্তু শরৎচন্দ্রের জীবনে

এই নারীদের হুবহু রূপ খুঁজে পাওয়া মুশকিল। শ্রীকান্ত ছন্নছাড়া জীবনের ঘূর্ণাবর্তে বিভিন্ন নারীর সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে ঘুরপাক খেয়েছে। এই নারীরা সুনন্দা ব্যতীত সবাই সমাজে কলুষিতা, নিগৃহীতা, সর্বোপরি নির্যাতিতা। শরৎচন্দ্রও জীবনে অনেক নারীর সাহচর্যে এসেছেন। কিশোরকালে নিরুপমা দেবীর (বুড়ী) সঙ্গে প্রেম নিয়ে অনেক রটনা হয়েছে। অনেকের ধারণা নিরুপমার জন্যই তিনি দেশছাড়া হয়েছিলেন। কৈশোরের উচ্ছৃঙ্খল শরৎচন্দ্র বাল্যবিধবা নিরুপমাকে চিঠি লিখে বিপদে পড়েছিলেন। যার জন্য বাড়িতে বড়দের কাছে নিরুপমাকে হেনস্থা হতে হয়। সেই অভিযোগে নিরুপমা শরৎচন্দ্রকে চিরকূট পাঠান —

> ''এখানে যোগাযোগ আর কখনও রাখবেন না; আপনি এদেশ থেকে চলে যান। আমাকে নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচতে দিন।''[১৯]

(তবে চিরকূটের ভাষা শরৎচন্দ্রের নিজমুখে বলা)। শরৎচন্দ্র নিরুপমাকে কখনও ভুলতে পারেননি। তাকে না পাওয়ার বেদনা সারাজীবন মনে ছিল। যখনই কোনও বাল্যবিধবার কথা, গল্পে-উপন্যাসে লিখেছেন তাঁর মধ্যেও এই বেদনাই হয়তো জীবনসঞ্চার করেছে। তাঁর ব্যক্তিজীবনের প্রথম প্রেমের বেদনা রচনায় ভাষা পেয়েছে। 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধ গ্রন্থে তিনি এই বিষয়ের উপরই জোড় দিয়েছেন। লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত চিঠিতে বলেছিলেন —

> ''আমার সকল বই আপনি পড়িয়াছেন কিনা জানি না। পড়িয়া থাকিলে নিশ্চয়ই অন্ততঃ এই ব্যাপারটা চোখে পড়িয়াছে যে অনেকগুলি বড় এবং সুন্দর জীবন শুধু বিধবা বিবাহ সমাজে না থাকার জন্যই চিরদিনের জন্য ব্যর্থ নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে। ইহার অধিক নিজের সম্বন্ধে বলিবার আমার নাই।''[২০]

নিরুপমা দেবীও সে-সময়ের একজন পরিচিত লেখিকা। 'দিদি', 'অন্নপূর্ণার মন্দির', 'বিধিলিপি' ইত্যাদি তাঁর রচনা। এই নারীই শান্তির কামনায় একদিন পূজা, জপ, তপ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তার লেখায় ছেদ পড়ল। শরৎচন্দ্র ব্যথিত হয়ে নিরুপমার ভাই পুঁটু অর্থাৎ বিভূতিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন নিরুপমার কথা। সে কি এখনও পুজোপাঠে লেগে থাকে, যার উত্তর দরদী শরৎকে নিশ্চয় ব্যথিত করেছিল। বিভূতি বলেছিল —

> ''কি করবে শরৎদা, ব্রাহ্মণ ঘরের বিধবা, ছেলে মেয়ে নেই, আমার ছেলে-মেয়ে আর ঠাকুর দেবতা, এদের নিয়েই দিন কাটায়; ভুলে তো থাকতে হবে।''[২১]

এই উত্তরের নিহিতার্থের বেদনার একটি ঝলকই কি দেখি আমরা রাজলক্ষ্মীর চরিত্রে। কট্টর হিন্দু সংস্কারের বাল্যবিধবা রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে ও শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীকে সামাজিকভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। নিরুপমার মতই জপ-তপ-বার ব্রত ও অন্যের সন্তান (সতীনের সন্তান) বঙ্কুকে নিয়েই মাতৃত্বের আহ্লাদ খোঁজে। কমললতার পরমাত্মার কাছে (কৃষ্ণ) নিবেদিত প্রাণের ভাবোচ্ছ্বাসের মধ্যে কি নিরুপমার বেদনা লক্ষ করা যায় না। এভাবেই তো দক্ষ শিল্পী শরৎচন্দ্র তাঁর বাস্তব জীবনবেদনাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে তাকে অনন্য পরিশীলনে উপস্থাপন করেছেন 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে। নিরুপমা দেবী মৃত্যুকালে কয়েকদিন বৃন্দাবনে ছিলেন। তখন শরৎশিষ্যা কবি রাধারাণী দেবী এবং কবি নরেন দেব তার সঙ্গে একবার গিয়ে দেখা করেন জীবনের অন্তিম পর্যায়ে। তখন আবেগে নিরুপমা দেবী রাধারাণীর বুকে মাথা রেখে গভীর বেদনায় বলেছিলেন —

> ''তুমি আমার শরৎদার রাধু। তুমি আমার শরৎদার রাধু। শরৎদার যে বাউণ্ডুলে দশা হয়েছিল, সে শুধু আমারই জন্য।''[২২]

শরৎচন্দ্রের কৈশোরকালের ব্যর্থ প্রেমে, অকাল মাতৃবিয়োগে, অর্থকষ্টে, পড়াশোনায়ও ব্যাঘাত ঘটে। মা ভুবনমোহিনীর মৃত্যুর পর গাঙ্গুলীবাড়ী (মাতুলালয়) থেকেও সাহায্য বন্ধ হয়ে যায়। অতিশয় দৈন্যদশায় পরিবার নিশ্চল হয়ে পড়ে। উদাসী প্রকৃতির বাবা মতিলালেরও সংসারের বাহ্যিক জ্ঞান ছিল না। এই অবস্থায় বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে শরৎচন্দ্র একদিন গৃহত্যাগ করে নিরুদ্দেশ হয়ে যান। এভাবে পথে পথে শরৎচন্দ্র কখনও সাধুসঙ্গ লাভ করে কিছুদিন সন্ন্যাসীর জীবন কাটান। কখনও জমিদার মহাদেব সাহুর আতিথ্য গ্রহণ করেন। অত্যধিক মাদকাসক্তি ও নেশামগ্ন থাকায় ভদ্র আত্মীয়, বন্ধু বান্ধবরা তাকে এড়িয়ে চলতেন। তিনিও এভাবে মন্দের সঙ্গে মন্দ হয়ে সমাজ-নিষিদ্ধ পতিতালয়ে, সমাজের নীচু শ্রেণির মানুষের সঙ্গে অধিক আত্মীয় হয়ে পড়তেন। হঠাৎ বাবা মতিলালের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে একদিন তিনি বাড়ি ফিরে আসেন। বড় দিদি অনিলাদেবীর বিয়ে হয়ে গিয়েছিল ইতিপূর্বে। কিন্তু অন্যান্য তিন ভাই বোনের দায়িত্ব এসে পড়ল শরৎচন্দ্রের উপর। বাড়িওয়ালা বাড়ি খালি করতে বলল। এই অবস্থায় ভাই বোনদের আত্মীয় স্বজনদের বাড়িতে রেখে তিনি বেরিয়ে পড়লেন জীবিকার্জনের পথে। নিজ দেশে ব্যর্থ হয়ে নানা ঘাত-সংঘাতে, অর্ধাহারে, অনাহারে দারিদ্র্যের অসম্ভব উৎপীড়ন সহ্য করতে না পেরে তিনি রেঙ্গুনে ছোটকাকা অঘোরনাথের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। শুরু হল শরৎচন্দ্রের জীবনের নতুন আরেক অধ্যায়। জীবনের পথে শরৎচন্দ্র বিভিন্ন নারী-সংসর্গে কাটিয়েছেন সত্যি। তাঁকে নিয়ে নানা কুৎসা, গুজব রটানো

হত। নিরুদ্দেশ জীবনে বাইজী সঙ্গ, পতিতালয়ে গমন, চাকরির খোঁজে, বাসস্থানের জন্য সমাজের নীচুতলায়, মিস্ত্রি পল্লী, শ্রমিকদের পল্লীতে কাটাতে হয়েছে। তাঁকে নিয়ে নানা বিতর্কও হয়েছে। প্রবাসী জীবনে গায়ত্রী নামে একটি মেয়েকে উদ্ধার করতে গিয়ে তিনি তার প্রেমে পড়ে যান। মেয়েটি ছিল বাল্যবিধবা। সে শরৎচন্দ্রকে শ্রদ্ধা করত কিন্তু প্রেম করেনি। আবার শরৎচন্দ্র ভগ্নহৃদয় নিয়ে সবার আড়ালে নীরবে সাহিত্য সাধনা করতেন এবং দিনে অফিসে যেতেন। মিস্ত্রিপল্লীতে তিনি যে বাড়িতে থাকতেন সেখানে একটি ব্রাহ্মণ তার যুবতী মেয়েকে নিয়ে থাকত। অত্যন্ত নেশাখোর, মাদকাসক্ত ব্রাহ্মণের ঘরে সন্ধ্যার সময় মদ, জুয়ার আড্ডা বসত। এই আড্ডারই একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সঙ্গে টাকার বিনিময়ে মেয়ে শান্তিকে জোর করে বিয়ে দিতে চান। শান্তি দেবী উপায়ান্তর না দেখে শরৎচন্দ্রের কাছে গিয়ে উপস্থিত হন ও সাহায্যের ভিক্ষা করেন। এই দুর্গত মেয়েটিকে উদ্ধার করে তিনি পরিস্থিতির বিপাকে বিয়েও করেছিলেন। শান্তি দেবীর সঙ্গে শুরু হল এই ভবঘুরের সাংসারিক জীবন। একটি পুত্রসন্তানও ছিল শরৎচন্দ্রের। কিন্তু ভাগ্যের মারে এই ছন্নছাড়ার নিয়তি তাঁকে আবার ভবঘুরে করল। প্রবাসে ভয়াবহ মহামারী প্লেগের আক্রমণে বৎসরান্তেই শান্তি দেবী ও পুত্রকে শরৎচন্দ্র হারালেন। শান্তি দেবীকে নিয়েও অনেকে দুর্নাম রটিয়েছেন যে শান্তি দেবীর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সম্পর্ক বিবাহবহির্ভূত কি না। মেদিনীপুরের কোনো শালবনীয় চক্রবর্তী বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী শ্রীকৃষ্ণ অধিকারীর মেয়ে মোক্ষদা। স্ত্রী ও তিন মেয়ের মৃত্যুর পর ছোট মেয়ে মোক্ষদাকে নিয়ে চক্রবর্তী মহাশয় দেশত্যাগ করে বর্মায় গিয়েছিলেন। পরবর্তী পর্যায়ে এই মোক্ষদাকে শরৎচন্দ্র বৈষ্ণবমতে কণ্ঠীবদল করে বিবাহ করেন। মোক্ষদার নাম পরিবর্তন করে রাখেন হিরণ্ময়ী। এই হিরণ্ময়ী শরৎচন্দ্রকে আবার ঘরমুখো করলেন। যিনি শেষজীবন পর্যন্ত শরৎচন্দ্রের সঙ্গিনী ছিলেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র নারী-বিতর্ক থেকে মুক্তি পাননি। তাঁর উপর সমাজের অনেক লোকের সংশয় ছিল। তাই শরৎচন্দ্র বন্ধুবর হরিদাস শাস্ত্রীকে কৈফিয়ত দেন —

> ‘‘মেয়েদের সম্বন্ধে আমি কখনই উচ্ছৃঙ্খল ছিলাম না, আজও নই; খুব নেশা করেছি, অনেক খারাপ খারাপ জায়গায় গেছি, কিন্তু তুমি যদি খোঁজ নাও তবে জানতে পারবে তারা কেউ আমাকে ‘দাদাঠাকুর’, কেউবা ‘বাবাঠাকুর’ বলত। অত্যন্ত বেহুঁশ অবস্থাতেও কখনও আমি তাদের শরীরের প্রতি লোভ করি নি। এর কারণ এই নয় যে আমি সংযমী, সাধু বা নীতিবাগীশ ছিলাম,

এর কারণ ওসব ছিল আমার রুচিবিরুদ্ধ। যাকে ভালবাসতে পারলাম না, তাকে উপভোগ করবার ইচ্ছা আমার শরীরে কখনও জাগে নি। এর আরেকটি কারণও বলেছেন রবীন্দ্রনাথের গানের কলি দিয়ে তিনি হরিদাস শাস্ত্রীকে —

''কখনো কুপথে যদি ভ্রমিতে চাহে এ হৃদি
অমনি ও মুখ স্মরি শরমেতে হই সারা।

— শোন প্রথম যৌবনে, আমি এক মেয়ের প্রেমে পড়েছিলাম; সে প্রেম ব্যর্থ হয়। কিন্তু সমস্ত উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যেও চিরদিন আমার সামনে সে দাঁড়িয়ে থেকেছে।''[২৩]

আমরা এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিজীবনে নারীকেন্দ্রিক সম্পর্ক, প্রেম, সাংসারিক জীবন সম্পর্কে কিছুটা অবহিত হই। এই কারণেই বোধহয় তাঁর জীবনে ছিল অস্থির ভাবাবেগ, ব্যর্থ প্রেমের বেদনা কিন্তু অন্তরে ছিল তার মধুর স্মৃতি। জীবনের এই চরম বাস্তব, বেদনা, অনুভূতি ও উপলব্ধিই তাঁর সাহিত্যে চরিত্র রূপায়ণে জীবন্ত রূপ লাভ করেছে। নারীর প্রতি গভীর মমত্ববোধ সহানুভূতি দরদ ছিল বলেই তাঁর সাহিত্যে নারীর একটি বিশেষ অবস্থান রয়েছে। আমরা শ্রীকান্ত উপন্যাস রচনার উদ্দেশ্য এবং পরবর্তী সময়ে রচনাশৈলীর বিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা থেকে জেনেছি। সে সময়ে 'ভারতী' পত্রিকায় তিনি ভ্রমণকাহিনির মধ্যে আত্মপ্রসংশার সস্তা প্রচারে ব্যথিত হয়েছিলেন। তাই যথার্থ ভ্রমণকাহিনির স্বরূপ উদ্ঘাটনে তিনি হাত দিলেন। কিন্তু স্বভাবজাত সচেতন লেখকের রচনায় তা হয়ে উঠল নতুন রূপের, নতুন আদলের উপন্যাস। লেখার ধরন (style), কথকতার ভঙ্গি, বাস্তবজীবন নির্ভর উপাদানে তা আত্মজীবনীমূলক হয়ে উঠল। শরৎচন্দ্র নিজেকে সবসময় আড়ালে রাখতে চেয়েছেন। ১৯০৩ সালে কুন্তলীন পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্প 'মন্দির', তারপর 'বড়দিদি' তিনি অন্যদের নামে লিখেছিলেন। এধরনের লেখককে তার রচনায় হুবহু খোঁজা দুঃসাধ্য। এখানে বলা প্রয়োজন শরৎচন্দ্রের জীবনে এবং চেতনায় নারীর দুঃখ, যন্ত্রণা, নির্যাতন বিশেষ প্রভাব ফেলেছে। যার ফলে তাঁর সমগ্র রচনায় নারী একটা বিশেষ জায়গা জুড়ে আছে। 'শ্রীকান্ত'-তেও তাই অসংখ্য টুকরো, বিক্ষিপ্ত ছোট বড় নারী কাহিনি-ই মুখ্য স্থান লাভ করেছে। তৃতীয়ত 'শ্রীকান্ত' শরৎচন্দ্রের সমস্ত রচনার মধ্যে দীর্ঘ সময় পরিসরের প্রেক্ষিতে রচিত আলেখ্য। আর তা শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা অর্জন করেছে। আমরা শরৎচন্দ্র এবং শ্রীকান্তের মধ্যে কিছু কিছু ঘটনায় একটা আপাত মিল আলোচনা করে

দেখেছি। এই উপাদানগুলো শরৎচন্দ্রের জীবনের সত্যতাকে নির্ভর করে রচিত। শরৎচন্দ্রের জীবনে নারীর যে বিশেষ অবদান ছিল ঠিক তেমনি শ্রীকান্ত উপন্যাসেও সমাজে নারীর-ই অবস্থানের একটি ইতিহাস বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কিন্তু শ্রীকান্ত উপন্যাসে সমাজে নিষিদ্ধা, পতিতা, নিগৃহীতা, অবহেলিতা নারীরাই উপস্থিত। বিশেষভাবে সমাজে 'পতিতা' কলঙ্কিনী রূপে অভিহিত নারীদেরই পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন লেখক। প্রশ্ন জাগে কেন এই 'পতিতা-কলঙ্কিত' রূপে অভিহিত নারীদেরই তুলে আনলেন শ্রীকান্তের জবানিতে, জীবনে, সংশ্রবে। লেখক শরৎচন্দ্রের তো অনেক সম্মানীয়, শিক্ষিত পরিবারের নারীদের, লেখিকা-শিষ্যাদের সঙ্গে পরিচয়, ঘনিষ্ঠতা, মত-বিনিময় ছিল। যেমন নিরূপমা, অনুপমা, রাধারাণী, লীলা গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ অনেক। তাছাড়াও তার জীবনে বিঘ্ন ঘটলেও শান্তিদেবী, হিরণ্ময়ী স্ত্রী রূপে ছিলেন। এদের তো প্রতিরূপ নেই এই প্রতিবেদনে। আগাগোড়া 'শ্রীকান্ত' চরিত্রের সঙ্গে প্রকৃতিতে, ছন্নছাড়া সন্ন্যাসী জীবন, কৈশোরের কিছু ঘটনা এবং স্বভাবে অন্তর্মিল ছাড়া কোনো দৃষ্টান্তই পাওয়া যায় না। শ্রীকান্ত উপন্যাসের লেখক শরৎচন্দ্র তাহলে কীভাবে আত্মজীবনীর মধ্যে উপন্যাসায়ন ঘটালেন। এর উত্তরে আমাদের তাঁর সামগ্রিক দার্শনিকসুলভ, মানবদরদী, দেশপ্রেমিক, নারীদরদী ভাবনাকে দেখতে হবে। সর্বোপরি সূক্ষ্ম সমাজতাত্ত্বিক চিন্তানায়কের লেখক চরিত্রটিকে ধরে এগোতে হবে। আর ধারাবাহিক শ্রীকান্ত উপন্যাস আলোচনায় এই দিকগুলির বৈশিষ্ট্য খুঁজতে হবে।

ভবঘুরে শ্রীকান্ত উদ্দেশ্যহীনভাবে চলতে চলতে যেখানেই গিয়ে উপস্থিত হয়েছে তা ছিল তথাকথিত সমাজের কাছে অবহেলিত। বর্মা মুলুকে জীবনের অনেক কাল অতিবাহিত করেছেন। 'শ্রীকান্ত'-এ নিম্নশ্রেণির পাড়াগাঁ এবং বিশেষভাবে নারীচরিত্রগুলো ছিল সমাজের নিগৃহীতা, পতিতা। যারা ভদ্র সমাজের কাছে শুধুই 'ছি-ছি' এর উপযুক্ত। শরৎচন্দ্র এই 'ছি-ছি'র অধ্যায়টাই তুলে ধরতে চেয়েছেন। তাঁর উপন্যাসে জীবনের প্রত্যক্ষ সমাজপরিবেশ এবং বিশেষ করে সমাজের পতিতা, নিগৃহীতারাই উপজীব্য চরিত্র। এবং তাদের জীবনকেই বিষয়বস্তু করে সমাজ-আলেখ্য প্রস্তুত করলেন। কারণ ব্যক্তিজীবনেও শরৎচন্দ্র ভাগ্য বিড়ম্বনায়, বোহেমিয়ান স্বভাবের জন্য আত্মীয়, সমাজ সবার কাছেই ছিলেন মস্ত 'ছি-ছি' এর পাত্র। তাঁর জীবনযাত্রা নিয়ে, বিভিন্ন নারীর সঙ্গে দুর্নাম ছড়ানো হত। তৎকালীন হিন্দু গোঁড়া সমাজ জাতিভেদে নিম্নশ্রেণির মানুষদের নির্মম বঞ্চনা ও অবজ্ঞা করতেন। কিন্তু প্রত্যক্ষ বাস্তব জীবনের সংস্পর্শে, অভিজ্ঞতায় শরৎচন্দ্র এই নিম্নশ্রেণির মধ্যেই দেখতে পেয়েছিলেন সততা ও মনুষ্যত্বকে। যারা দুঃখ, কষ্ট, বঞ্চনা,

অত্যাচার সবই সহ্য করে কিন্তু মনের গরিমা মাধুর্য হারায় না। সমাজ প্রত্যক্ষভাবে না দেখে অন্যকে পতিত মনে করে। নীচু শ্রেণি বলে জাতিভেদজ্ঞানে দূরে সরিয়ে 'ছি-ছি' ছাড়া কিছুই করতে পারে না। এই 'ছি-ছি' তা যে অত বড় নয় এবং তার জন্য মর্মমূলে দায়ী সমাজ-সংস্কার, তাদের বিধি-বিধান। গোঁড়া হিন্দু জাতীয়তাবাদ এবং বুর্জোয়া সামন্ততান্ত্রিক নৈতিকতার ফলেই 'দেশ-কাল'এ মানুষ আজ নিষ্পেষিত। কিন্তু এই নিষ্পেষণ, বঞ্চনা একদিন সবাইকে যে টেনে আনবে ধূলায় তারই নিদর্শন তৈরি করেছেন এই সূক্ষ্ম সমাজতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষক। তার মূলে রয়েছে শরৎচন্দ্রের গভীর সমাজচেতনা। আর এই সমাজচেতনার মূল সুর স্পর্শ করেছে নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে।

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে আছে শরৎচন্দ্রের বিস্তৃত দীর্ঘ প্রত্যক্ষ বাস্তব জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে অর্জিত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি। সমাজের ব্যভিচার ও নীচুতলার মানুষের নির্যাতিত জীবনের ছবি। তার কারণ উদ্ঘাটন করতে গভীর অনুসন্ধিৎসু জিজ্ঞাসু মন নিয়ে দেশ-কাল-সমাজ ও মানুষের আন্তঃসম্পর্কের গভীর অনুধ্যানে, আত্মবীক্ষণের মাধ্যমে সমীক্ষা করেছেন। তাই তাঁর রচনায় অসংখ্য চরিত্র, টুকরো, বিক্ষিপ্ত, ছড়ানো-ছিটানো ছবিকে একসঙ্গে এঁকেছেন। চেষ্টা করেছেন একটি পরিপূর্ণ সমাজের রূপচিত্র অঙ্কনের।

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের কিছু ঘটনা থেকেই এই সমাজ আলেখ্যের দিকগুলি স্পষ্ট হয়। যেখানে রয়েছে আমাদের সমাজ, দেশ এর পরাধীনতার ছবি। রক্ষণশীল মনোভাবের ফলে দেশের উন্নয়নে বিপত্তি এবং জীবনের গ্লানিকর অধ্যায়গুলি। প্রথমত, আমরা দেখেছি নারীর নিষ্পেষণ ও অবমাননার মূলে আছে সামাজিক জাতিভেদ প্রথা, কুসংস্কার। এই অবমাননা, বঞ্চনা করে সমাজ অলক্ষ্যে নিজেরই ক্ষতি সাধিত করছে। যার ফলে দেশ, সমাজে একদিন ধ্বংস নেমে আসতে বাধ্য হবে।

দ্বিতীয়ত রক্ষণশীল সমাজের গোঁড়ামি, ছোঁয়াছুঁয়িতে মানবতার অবলীলায় মৃত্যু ঘটেছে। এই রক্ষণশীলতার ফলে মানুষ মানুষের থেকে জাতির নামে উঁচু নীচু ভেদাভেদে দূরে সরে যাচ্ছে।

তৃতীয়ত 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের ৩য় পর্বে শরৎচন্দ্র শ্রমিকদের অসহায় মৃত্যুর বর্ণনায়, ধনতান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থার প্রতি ক্রুদ্ধ কণ্ঠে অভিসম্পাত করেছেন।

চতুর্থত বাল্যবিধবা, পণপ্রথা সম্পর্কে গ্লানি অনুভব করেছেন। সমাজের অন্তর্মূলে আঘাত করে মানুষের চৈতন্যকে জাগাতে চেয়েছেন।

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে শরৎচন্দ্র এভাবে কিছুটা নিজের জীবনের বাস্তব উপাদানে কিছুটা জীবন পরিক্রমায় আহরিত অভিজ্ঞতা, উপলব্ধিতে কাহিনি নির্মাণ করেছেন। দেশের প্রতি ভালোবাসা, নারীর প্রতি গভীর দরদে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মানুষের প্রতি মমত্বের গভীরতায় তাঁর কথা লাভ করেছে জীবন। সমাজ-চেতনার সামগ্রিকতায় মানবিক মূল্যবোধে দীপ্ত আত্মজীবনের একটি সমাজতত্ত্বমূলক জীবনদর্শন প্রস্তুত করেছেন। শরৎচন্দ্র বলেছিলেন —

> ''সংসারে যারা শুধুই দিলে, পেলে না কিছুই — যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত, মানুষ যাদের চোখের জলের কোন হিসাব নিলে না; নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনদিন ভেবেই পেলে না সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই কোন অধিকার নেই— এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে।''[২৪]

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের আত্মজীবনীর কিছুটা উপাদানের সাযুজ্য দেখা গেল। এভাবে কিছু জীবন উপাদানের গ্রহণে, হুবহু ঘটনার বাহুল্য বর্জনে, চরিত্রগুলোকে জীবন্ত করে তুলেছে। তাদের বিকাশ একটি বৃত্তাকার পরিমণ্ডলে ও শিল্পীমনের কল্পনার সংযোজনে পরিমার্জিত পরিশীলিত রূপ লাভ করেছে ঔপন্যাসিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত নালিশ জানিয়েছে সমাজের কাছে। মানবিক মূল্যবোধ গড়ে তুলতে সমাজে আঘাত করে সমাজের চৈতন্য জাগাতে চেয়েছে। নিপীড়িত দরিদ্র নিম্নশ্রেণির বঞ্চিতদের প্রতি, নিগৃহীত, নিষ্পেষিত নারীদের দুর্গত জীবনের প্রতি সমাজের স্বচ্ছ দৃষ্টিকে আকর্ষণ করতেই এই প্রতিবেদন।

শরৎচন্দ্র ও শ্রীকান্তের মানসগঠন ও জীবনসত্যের সন্ধান

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের কাঠামোয় শরৎচন্দ্রের জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা মূর্ত হয়ে উঠেছে। জীবনসত্যের সন্ধানে দৈনন্দিন নানা ছোটবড় ঘটনা নায়কের জবানীতে প্রতিফলিত হয়েছে। কাহিনির গতি বাংলাদেশের নানা গ্রাম, শহর কলকাতা, পাটনা, তীর্থস্থান বেনারস, কাশী ও বর্মার রাজধানী রেঙ্গুন পর্যন্ত ঘুরপাক খেয়ে প্রবাহিত হয়েছে। সমগ্র উপন্যাসটি একটি ভবঘুরের জিজ্ঞাসু মনের আত্মজিজ্ঞাসাকে কেন্দ্র

করে প্রসারিত হয়েছে। এই উপন্যাসে বিভিন্ন চরিত্র, বিভিন্ন পরিবেশে নিজের নিজের জীবন সংঘাতে জর্জরিত। কিন্তু এই সমস্ত চরিত্রগুলোর সবার নিজের মধ্যে নিজেদের প্রত্যক্ষ কোনো যোগাযোগ নেই। শ্রীকান্তের ভ্রাম্যমান পর্যবেক্ষণমূলক দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়েছে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কাহিনি নিয়ে। কিন্তু প্রত্যেকটি প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষ ঘটনার সঙ্গে শ্রীকান্তের ভবঘুরে জীবনের যাত্রাপথে কোনো না কোনো জায়গায় পরিচয় হয়েছে। আর এই ভবঘুরে জীবনকাহিনি বলতে বসে যা একসূত্রে গেঁথেছে শ্রীকান্ত। এই ঘটনা কাহিনিগুলোর যোগসূত্র স্থাপিত হয় শ্রীকান্তের মাধ্যমেই।

'শ্রীকান্ত' উপন্যাস চারটি পর্বে বিভক্ত। ১৯১৭ সালে প্রথম পর্বটি প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটি তারও ৩০ বৎসর পর শেষ হয়। সমস্ত উপন্যাসটিতে বিভিন্ন দিক যেমন জাতিভেদ, প্রেম ও কর্তব্যবোধ, নারীর অবমাননার প্রতি আলোকপাত রয়েছে। সেভাবেই ব্যক্তি ও সমাজের প্রতিনিয়ত সংঘটিত দ্বন্দ্ব, সংঘাতের ছবি প্রতিফলিত হয়েছে। ঔপন্যাসিক প্রতিবেদনের বৃহৎ পটভূমিকে কেন্দ্র করে সমাজ বাস্তব ও জীবনের সত্যকে শিল্পের সত্যে রূপান্তরিত করেছেন।

শ্রীকান্ত শান্তির খোঁজে বারবার বেরিয়ে পড়েছে নিরুদ্দেশভাবে। কখনও সন্ন্যাসী হয়েছে তো কখনও জীবিকার সন্ধানে। নিজ দেশে বিফল হয়ে বার্মা মুলুকে রেঙ্গুনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন চাকরি নিয়েছে। বার্মা যাওয়ার পথেই জাহাজে অভয়া ও রোহিনীর সঙ্গে পরিচয়। রেঙ্গুনে পরবর্তীকালে আত্মীয়তা বেড়েছে। স্রষ্টা শরৎচন্দ্রও সাহিত্যে খ্যাতি লাভ করার আগে দুঃখ-দুর্দশাক্লিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেছেন। জীবিকার সন্ধানে নিজ দেশে বিফল মনোরথ হয়ে বার্মায় পাড়ি দিয়েছিলেন। তাঁর বাউণ্ডুলে স্বভাবের জন্য, অত্যধিক নেশার জন্য আত্মীয়দের মধ্যে দুর্নাম ছড়িয়ে পড়েছিল। যার জন্য তার জীবনের প্রতি সবার একটি বড় ধরনের ছি ছি ভাব ছিল। উপন্যাসের শুরুতে শ্রীকান্তও নিজের কথা বলতে গিয়ে বলেছে —

> ''ছেলেবেলা হইতে এমনি করিয়া বুড়া হইলাম। আত্মীয় অনাত্মীয় সকলের মুখে শুধু একটা একটানা 'ছি ছি' শুনিয়া শুনিয়া নিজেও নিজের জীবনটাকে একটা মস্ত 'ছি ছি ছি' ছাড়া আর কিছুই ভাবিতে পারি নাই। কিন্তু কি করিয়া যে জীবনের প্রভাতেই এই সুদীর্ঘ 'ছি ছি'র ভূমিকা চিহ্নিত হইয়া গিয়াছিল, বহুকালান্তরে আজ সেই সব স্মৃত ও বিস্মৃত কাহিনীর মালা গাঁথিতে বসিয়া যেন হঠাৎ সন্দেহ হইতেছে, এই 'ছি ছি'টা যত বড় করিয়া সবাই দেখাইয়াছে,

হয়ত ঠিক তত বড়ই ছিল না ..... মনে হইতেছে, হয়ত ভগবান যাহাকে তাঁহার বিচিত্র সৃষ্টির ঠিক মাঝখানটিতে টান দেয়, তাহাকে ভাল ছেলে হইয়া একজামিন পাশ করিবার সুবিধাও দেন নাই।"[২৫]

শ্রীকান্ত প্রথম পর্বে মাতুলালয়ের যে বর্ণনা আছে তার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের মিল আছে। শৈশবের চারপাশের পরিবেশ, ঘটনার সঙ্গে বাস্তব ও নিবিড় সম্পর্ক ছিল। পিসেমশাইর বাড়ির কড়া শাসনে নিয়ম-রীতিতে, শ্রীকান্তেরও শৈশব জীবন অতিবাহিত হয়েছে। শ্রীকান্তের স্রষ্টা শরৎচন্দ্র শৈশবে প্রতিপালিত হন মাতুলালয়ে। দরিদ্রের ছেলে পেটেভাতে থেকে শিক্ষার্জন করবে। কিন্তু শরৎচন্দ্রের স্বভাবে ছিল বৈরাগ্যের সুর, উদ্দেশ্যবিহীন পথচলা, কল্পনায় আনন্দ খোঁজা, এমন ছেলে কি করে বিষয় বুদ্ধির জ্ঞান আহরণ করবে। সারাজীবন তাকে মন্দ ছেলের অভিধা পেতে হয়েছে। শরৎচন্দ্র বলেছিলেন তিনি বাবার কাছ থেকে অশান্ত মন ও গভীর সাহিত্যপ্রেম ছাড়া উত্তরাধিকারসূত্রে কিছুই পাননি। শরৎচন্দ্র সাহিত্য সাধনা করতেন গোপনে কিন্তু পরাশ্রয়ে, স্বভাবসিদ্ধ বাউণ্ডুলেপনার জন্য অবজ্ঞা, তাচ্ছিল্য তাঁর ভাগ্যে জুটেছিল। সমাজ সংসারের হিন্দু গোঁড়ামির প্রতি তাঁর অবজ্ঞা ও সংশয়, দ্বন্দ্ব শৈশব থেকেই মনে প্রোথিত হয়েছিল। জাতিভেদ প্রথা, অন্ধ সংস্কার, শৈশবেই শরৎচন্দ্রের মনে তিক্ততার জন্ম দিয়েছিল। তাই তাকে নাস্তিক বলে সব আত্মীয়স্বজন অবজ্ঞা করতেন। শৈশব এবং কৈশোরের রঙিন দিনগুলি পরাশ্রয়ে ব্যক্তিত্বহীন ভাবে, আর্থিক সংকটে কাটাতে হয়েছে তাঁকে। ভাগ্যের বিড়ম্বনা এতই কঠোর যে এই সময়েই মায়ের মৃত্যু হল। আরো বিড়ম্বনাপূর্ণ জীবনে গিয়ে পড়লেন তিনি। তারপর বাবারও মৃত্যু, পাঁচ ভাই বোনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শরৎচন্দ্রের উপর পড়ল সবার দায়িত্বভার। জীবিকার সন্ধানে আবার দেশছাড়া হয়ে পড়তে হল তাঁকে। যেমন হয়েছিল উদাসীন প্রকৃতির শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট শ্রীকান্ত। শৈশবে পিসির বাড়িতে লালিত-পালিত হয় শ্রীকান্ত। স্বভাবে উদাসীন শ্রীকান্তও একদিন দেশছাড়া হন। যার ফলে স্রষ্টা শরৎচন্দ্র বা সৃষ্টি শ্রীকান্ত ঠকেননি। বরং লাভ করেছিলেন জগৎ ও জীবন সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি। এবং সমাজে বিচিত্র সৃষ্টির মাঝখানে তারা নিজেকে আবিষ্কার করেন। দেখেন, দেশ, কাল, সমাজের প্রেক্ষিতে জীবনকে। সন্ধান পান জীবনসত্যের। যার আলেখ্য বাস্তব ও কল্পনার সংমিশ্রণে স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টি শ্রীকান্তের যুগলবন্দির জীবনভাষ্য 'শ্রীকান্ত'। নায়ক শ্রীকান্তেরও শৈশব থেকে জাতিভেদ ও সমাজ-সংস্কারের গোঁড়ামির ফলে তিক্ত অভিজ্ঞতায় ভরে ওঠে মন। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের শুরুতেই লেখকের কলমে শ্রীকান্তের ভাষ্যে শোনা যায় —

> ‘‘মনে হইতেছে, হয়ত ভগবান যাহাকে তাঁহার বিচিত্র সৃষ্টির ঠিক মাঝখানটিতে টান দেন, তাহাকে ভাল ছেলে হইয়া একজামিন পাশ করিবার সুবিধাও দেন নাই, ... বুদ্ধি হয়ত তাহাকে কিছুটা দেন, কিন্তু বিষয়ী লোকেরা তাহাকে সুবুদ্ধি বলে না — তাই প্রবৃত্তি তাহাদের এমনি অসঙ্গত খাপছাড়া ..... তারপরে মন্দ ছেলেটি যে কেমন করিয়া অনাদরে অবহেলায় মন্দের আকর্ষণে মন্দ হইয়া, ধাক্কা খাইয়া, ঠোক্কর খাইয়া অজ্ঞাতসারে অবশেষে একদিন অপযশের ঝুলি কাঁধে ফেলিয়া কোথায় সরিয়া পড়ে — সুদীর্ঘ দিন আর তাহার কোন উদ্দেশ্যই পাওয়া যায় না।’’[২৬]

শরৎচন্দ্র ও তাঁর শ্রীকান্ত স্বভাবে ও প্রকৃতিতে উদাসীন, বৈরাগ্যময় জীবন ধারণে অভিন্ন। তাঁদের শৈশবের জীবনচর্যার পরিবেশ বর্ণনা ও ঘটনার অনেকটা আবার মিল আছে। সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলির বর্ণনায় পিসেমশাই বৃদ্ধ রামকমল ভট্টাচার্য ছোড়দা, যতীনদা সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া যায় সেখানে। আসলে জীবনের তথ্যগুলো সাহিত্যে শিল্পের খাতিরে শরৎচন্দ্র নিজেকে আড়াল করতে রূপান্তরিত করেছেন। স্বভাবে যেমন ছিল বৈরাগ্যের টান, ঠিক তেমনি শরৎচন্দ্র ও শ্রীকান্ত চরিত্র দুজনের মধ্যেই ছিল আর্থিক দুরবস্থার জন্য পরাধীন, গ্লানিময় জীবনযন্ত্রণা। এই জীবন থেকে বেরোতে জীবিকার সন্ধানে দুই প্রয়োজনেই তারা ঘরছাড়া হয়। সমাজ, সংসার তাদের কোনোদিন খোঁজ রাখেনি। তাই অনেক সময় তাদের কোন উদ্দেশ্যই পাওয়া যেত না। এই উদ্দেশ্যবিহীন জীবনই তাদের দাঁড় করিয়েছিল অন্যান্য জীবনের মুখোমুখি। যে অভিজ্ঞতা, জীবনোপলব্ধির ফলে ‘শ্রীকান্ত’ উপন্যাসে বিভিন্ন চরিত্রের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে।

শরৎচন্দ্রের প্রায় সমস্ত রচনাই পল্লীজীবন কেন্দ্রিক। সমাজের বাস্তব রূপ, হিন্দুধর্মের গোঁড়ামি, জাতিভেদের বলি নায়ক-নায়িকার প্রাণবিদারক কাহিনি স্থান করে আছে তাঁর গল্প-উপন্যাসে। বিধবাদের সমাজে দুর্দশার বৃত্তান্ত ও বিভিন্ন জটিল সমস্যা উত্থাপিত করে সমাজের প্রতি যেন তর্জনি সংকেত করেছেন। সমাজে ধর্মের গোঁড়ামির ফলে দুর্দশাক্লিষ্ট নারীজীবন, নারী অবমাননা তাঁর মনকে ব্যথিত করেছে। তাই তাঁর উপন্যাসগুলোতে ভিড় করে আছে নারীচরিত্রগুলো। তাদের মধ্যে কেউ সারাটা জীবন সহ্য করে সমাজবিধানের নিয়তিকে। কেউ বিদ্রোহ করে আবার সমাজের চাপেই তার বিদ্রোহের আগুন থেমে যায়। এমনি অসংখ্য চরিত্র কিরণময়ী, রমা, সাবিত্রী, অচলা, অভয়া, রাজলক্ষ্মী, অন্নদাদিদি প্রভৃতিরা তাঁর সাহিত্যে

ক্ষীণ রূপ নিয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এইসব উপন্যাসের রচনাশৈলী, বিষয়বস্তু থেকে সম্পূর্ণ আলাদা 'শ্রীকান্ত'। তার লিখনশৈলী, বিষয়বস্তু আলাদা পথে চলেছে। শ্রীকান্ত জীবনের শেষপ্রান্তে অপরাহ্ন বেলায় ফিরে দেখেছে বিগত জীবনের স্মৃত-বিস্মৃত অনেক ঘটনা। যেখানে একজন ভবঘুরে পরিণত বয়সে স্মৃতিচারণা করেছে। আত্মসমীক্ষণ ও আত্মসমালোচনায় মগ্ন হয়েছে। তার জীবন কীভাবে বিভিন্ন মানুষের জীবনের সংঘাতময় ঘটনার অভিজ্ঞতায় ঘুরপাক খেয়ে জীবনের সত্যে উপনীত হয়েছে তারই ভাষ্য এই প্রতিবেদন। এখানে ভিড় করেছে অসংখ্য চরিত্র, বিচিত্র সমাজ ও পরিবেশের বর্ণনা। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাস জুড়েই আছে ছোট-বড়, প্রত্যক্ষ দৃষ্ট, শ্রুত বিভিন্ন চরিত্রের আনাগোনা। সব চরিত্রগুলো শ্রীকান্তের শৈশব থেকে কৈশোর, যৌবন, মধ্য যৌবনের বিস্তৃত সময় জুড়ে অবস্থান করেছে। বিচিত্র সব ঘটনা — শ্রীকান্তের জবানিতে তার বর্ণনা - বিস্তার - অভিজ্ঞতালব্ধ জীবনদৃষ্টি সবই উপস্থিত। কিন্তু এই বৈচিত্র্যময় ঘটনা চরিত্রের বৃত্তাকার পরিমণ্ডলে ঐক্য-সূত্র রক্ষায় শ্রীকান্ত প্রবেশ করেছে জীবন্ত সাক্ষী রূপে। শ্রীকান্ত ঘটনাচক্রে সমব্যথী হৃদয় নিয়ে ছোটো বড় সব চরিত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। তাদের মধ্যে বিচিত্র আত্মীয়তায় কাহিনির বৈচিত্রতাকে একসূত্রে গ্রথিত করেছে। পরিচয় যখন আত্মীয়তায় পর্যবসিত হয়, তখন তাদের সুখ-দুঃখ, ভাল-খারাপ সবই অনাবৃত হয়ে পড়ে। এবং ভাল মন্দই সম্পূর্ণ মানুষটির পরিচয় পাওয়া যায়, তাদের সঙ্গে একাত্মতাও গড়ে ওঠে। আর উপলব্ধি ও পরিচয়ের মাধ্যমে জীবনে নানা অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়। যার দ্বারা মানুষ জীবনসত্যের সঠিক সন্ধান খুঁজে পায়। যেমন পেয়েছিল শ্রীকান্ত। শৈশবেই শ্রীকান্তের জীবনের দীক্ষা হয়েছিল দুজন নিঃস্বার্থ মানুষের কাছে। যাদের দীক্ষা সারাজীবন তার জীবনের পাথেয় হয়েছে ও মনকে উদার করেছে। একজন শ্রীকান্তের বন্ধু ইন্দ্রনাথ অন্যজন অন্নদাদিদি। ইন্দ্রের কাছে শ্রীকান্ত পেয়েছিল অদম্য সাহস, স্বার্থত্যাগ ও পরোপকারের দীক্ষা। অন্নদাদিদির কাছে নিঃস্বার্থ ভালবাসা ও সত্যনিষ্ঠা পালনের জন্য জীবন ত্যাগের স্বরূপ। এই দুই চরিত্রেরই মিলিত শিক্ষাই তো শ্রীকান্তকে সারাজীবন লোকের কলঙ্কে না জেনে বিশ্বাস করতে বারণ করেছে। নিজের চরম কষ্টেও পরের দুঃখে ও বিপদে পিছপা হতে দেয়নি ইন্দ্রের সেই পরোপকারের জীবনপাঠ। ইন্দ্র ও অন্নদাদিদি চরিত্র দুটি মনে হয় যেন প্রতীকী চরিত্র। ইন্দ্র যেন প্রচলিত রীতি-নীতি অন্ধ-সংস্কার, ধর্মীয় বিধি-নিষেধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রতীক। সে সহজ মানবিক জ্ঞান ও জীবনসত্য দিয়ে ঐতিহ্যকে, বিধি সংস্কারকে অতিক্রম করে যাওয়ার পথকে সুদূর প্রসারিত করে। ইন্দ্র নামটিও যেন প্রতীকী। মানবের ষষ্ঠেন্দ্রিয় চেতনা বা অন্তরাত্মার ডাক। যে শুধু মানবাত্মার কাছে পৌঁছতে

চায়। অন্নদাদিদি এই নামটিও যেন দেবীপ্রতিমার প্রতীক। ধর্মীয়-বিশ্বাস, সামাজিক-আচার, চিরপ্রচলিত ঐতিহ্যের বাহক। যে মানুষকে প্রচলিত সংস্কারে আগলে রাখে। আরও লক্ষণীয় বিষয় এই দুই চরিত্রের সান্নিধ্য শ্রীকান্ত কৈশোরকালে বয়ঃসন্ধির সময় পেয়েছিল। যেটা দ্বন্দ্বকালীন সময়, একদিকে ইন্দ্র সমস্ত নিষেধকে অমান্য করে, প্রচলিত সংস্কারকে ভাঙ্গার আহ্বান জানায়। অন্যদিকে অন্নদাদিদির দৃঢ় ধর্মবিশ্বাস, অচল অনড় আদর্শের ভিত্তি প্রস্তরে সমস্ত অনাচার, অবিচার সহ্য করেও সংস্কারের বাঁধনে বেধে রাখতে চায়। আবার বিপরীতমুখী দুই ভাবের সমন্বয় যখন তাকে আত্মপ্রত্যয়ে জীবনসত্যের সন্ধান দিয়েছে; তখন অন্নদাদিদির অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রও নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছে। এই দুই চরিত্রের ক্ষণপ্রভা আলোয় আলোকিত হয়েই কিন্তু শ্রীকান্তের জীবনের পথ প্রসারিত হয়েছিল পরবর্তী জীবনে।

শৈশবেই পিসিমার বাড়িতে থাকাকালীন খেলার মাঠে শ্রীকান্তের ঝগড়া বাধে। একা শ্রীকান্তকে কয়েকটি ছেলে মারছিল। সেই মাঠে অপরিচিত একটি ছেলে বয়সে শ্রীকান্তের একটু বড় হবে। হঠাৎ কোথা থেকে এসে বিদ্যুৎবেগে কিছু বোঝার আগেই তাকে সেই ছেলেদের আক্রমণ থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে এল। এই তার ইন্দ্রের সঙ্গে প্রথম পরিচয়। পালাতে পালাতে একটি জায়গায় থেমে ইন্দ্র বিড়ি, সিদ্ধি খেল এবং শ্রীকান্তকেও খেতে বলল। শ্রীকান্ত বলে শৈশবের সেদিন, সেইক্ষণে নিঃস্বার্থ, পরোপকারী সেই অচেনা বন্ধুটির প্রতি তার মনোভাব স্পষ্ট হয়নি—

> ''শুধু একটি কথা স্মরণ করিতে পারিতেছি না — ঐ অদ্ভুত ছেলেটিকে সেদিন ভালবাসিয়াছিলাম, কিংবা তাহার প্রকাশ্যে সিদ্ধি ও ধূমপান করার জন্য মনে মনে ঘৃণা করিয়াছিলাম।''[২৭]

মাসখানেক পর সন্ধ্যার সময় পিসেমশাইর বাড়িতে শ্রীনাথ বহুরূপীকে বাঘ ভেবে বিরাট হুলুস্থূল কাণ্ড ঘটেছিল। সেখান থেকেই শ্রীকান্তের ইন্দ্রের সংস্রবে আসা। ইন্দ্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষ দুঃসাহসিক রোমাঞ্চের নৌকাযাত্রায় মাছচুরির বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়। এই মাছ চুরির ঘটনায় নৌকাভিযানে জীবনের কদর্য বাস্তবের সঙ্গে পরিচয় হতে থাকে শ্রীকান্তের। মাছ চুরি করে পালানোর পথে প্রথম বুনো শুয়োর, সাপ ও জেলেদের তাড়া খেয়ে ভুট্টা খেতের মধ্য দিয়ে নৌকা ঠেলে যেতে শ্রীকান্ত ভীষণ ভয় পাচ্ছিল। কিন্তু অদম্য সাহসে তাচ্ছিল্যভরে ইন্দ্রকে বলতে শুনেছিল যে 'মরতে একদিন ত হবেই ভাই।' শ্রীকান্ত আরও উপলব্ধি করেছিল এমন ভয়াবহ, বিপন্ন মুহূর্তে ইন্দ্রের স্বার্থত্যাগ এর স্বরূপ। নৌকা ঠেলতে ঠাণ্ডায় ভুট্টাখেতে সাপ, বুনো

শুয়োর থাকা সত্ত্বেও সে কোমর জলে একাই নেমেছিল। শ্রীকান্তকে একবারও বলেনি অনুরোধও করেনি, নেমে আয় বলে।

> ''জীবন মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে এই স্বার্থত্যাগ এই বয়সে কয়টা লোক করিয়াছে। ঐ বিনা আড়ম্বরে সামান্যভাবে বলিয়াছিল মরতে ত একদিন হবেই — এমন সত্য কথা বলিতে কয়টা মানুষকে দেখা যায়?''[২৮]

হিন্দু সমাজে জাতিভেদ, ছোঁয়াছুঁয়ির যে চরম রীতি-নীতির প্রচলন ছিল যা আজও কিছু কিছু আছে সমাজে। এই চরম কুসংস্কারের বৃত্তে ব্রাহ্মণঘরে জন্মে বংশগৌরব যারা করেন তারা কি মানবতা ভুলে যায়। ধর্মকেই বড় বলে মান্যতা দেয়। জাতির উপরে যে মানবধর্ম, হৃদয়ধর্ম বড় এবং মহৎ, তার মূল সত্যটুকুও সেদিন শ্রীকান্ত উপলব্ধি করেছিল। মাছ চুরির অর্জিত টাকা অন্নদাদিদিকে দেওয়ার জন্য যখন ঘাটে নৌকা লাগাতে একটি শিশুর মৃতদেহ শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রের চোখে পড়েছিল। পরদুঃখকাতর ইন্দ্র যখন মড়াটির একটি গতি করার কথা বলেছিল, শ্রীকান্ত ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপারে সংকুচিত হয়ে পড়ে উপলব্ধি করে,—

> ''পরদুঃখে ব্যথা পাইয়া চোখের জল ফেলা সহজ নহে, তাহা অস্বীকার করি না; কিন্তু তাই বলিয়া সেই দুঃখের মধ্যে নিজের দুই হাত বাড়াইয়া আপনাকে জড়িত করিতে যাওয়া সে ঢের বেশি কঠিন কাজ। তখন ছোট বড় কত জায়গাতেই না টান পড়ে''[২৯]

— এই কঠিন কাজটিই ইন্দ্রকে সমাধা করতে দেখেছিল সেদিন। ইন্দ্রের সেই সরল কিন্তু পরম সত্য মানবিক বাণী যা পরবর্তী পর্যায়ে শ্রীকান্ত জীবনের প্রতিক্ষণে উপলব্ধি করেছে — 'মরার কি জাত থাকেরে?' ইন্দ্রকে সে ভাল-মন্দে অনুভব করেছে। তার সরল কথার মধ্যে বাস্তবিক, মানবিক, নৈতিক জ্ঞানে পরম সত্যকে উপলব্ধি করেছে। 'মরার জাত নেই' এই কথার মধ্যে যে তীক্ষ্ণ সত্য আত্মগোপন করেছিল তাকে উপলব্ধি করেছিল। ইন্দ্র পরোপকারী, নিঃস্বার্থ, উদ্দেশ্য গোপন করে চলে না, কপটতা জানে না সেই ইন্দ্রই পারে প্রচলিত সমাজ সংস্কারকে অতিক্রম করে সত্যের আসল স্বরূপকে সহজভাবে অকপটে বলে দিতে। সেই পারে সত্যকে সত্য বলিয়া দেখিতে ও দেখাতে। শ্রীকান্তের তাই আত্মোপলব্ধি হয়,—

> ''বাস্তবিক, অকপট সহজ-বুদ্ধিই ত সংসারে পরম এবং চরম বুদ্ধি।''[৩০]

এই সত্যকে উপলব্ধি করেই শ্রীকান্তের মন প্রচলিত সংস্কারকে অগ্রাহ্য করে সংশোধিত হয়েছিল। এই ঘটনার দশ বারো বৎসর পরের কথা, তীর্থযাত্রা থেকে ফেরার পথে একজন বিধবার বিলাত ফেরত একঘরে পরিবারের আশ্রয়ে মৃত্যু হয়েছিল। এই কারণে সমাজের সংস্কারধর্ম পালনকারীরা কেউ এগিয়ে আসেননি তার সৎকারে। শ্রীকান্ত ও তার বন্ধুরা সৎকার করায় সমাজপতিদের কাছে তা ছিল অশাস্ত্রীয়। এই অশাস্ত্রীয় কাজের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সমাজ ধর্মরক্ষকরা বিধান দিয়েছিলেন, —

> ''কুলাঙ্গারদিগকে কেশচ্ছেদ করিতে হইবে, 'ঘাট' মানিতে হইবে, এবং এমন একটা বস্তু সর্বসমক্ষে ভক্ষণ করিতে হইবে, যাহা সুপবিত্র হইলেও খাদ্য নয়।''[৩১]

শ্রীকান্তরা উপায় না দেখে পাড়ার ডাক্তারকে বলেন, এবং পরোপকারী ডাক্তার এই ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে গ্রামে কারো চিকিৎসা না করার ঘোষণা করেন। স্বার্থান্বেষী এই সমাজপতিরা তখন বিনা দক্ষিণার ডাক্তার হারাবার ভয়ে এই বিধান প্রত্যাহার করেছিলেন। অর্থাৎ এই ঘটনা সনাতন হিন্দু ধর্মের চরম গোঁড়ামির পদতলে যে মানবিক ধর্ম ধূলিসাৎ করে দেওয়া হয় তারই বিবৃতি। নিজের অহং রক্ষায়, জাতিকে নিরাপদে উঁচুতে রাখতে সমাজপতিরা বিধান তৈরি করেন। এবং নিজের স্বার্থে আঘাত পড়লে, লোকসানের ভার তুলে নেওয়ার ভয়ে পরম সংস্কারের বিধানকে বদলাতে সংকোচ করেন না। এই ছিল সমাজের অভ্যন্তরীণ বাস্তব। শ্রীকান্ত তাই কখনও ইন্দ্রকে ভুলে না কারণ সেই বয়সে ইন্দ্র জাতপাতের, ধর্মীয় সংস্কারের ঊর্ধ্বে যে সত্যটি উচ্চারণ করেছিল তা —

> ''আমার বলিবার মূল বিষয়টি এই যে ইন্দ্র ঐ বয়সে নিজের অন্তরের মধ্যে যে সত্যটির সাক্ষাৎ পাইয়াছিল, অত বড় বড় সমাজপতিরা অতটা প্রাচীন বয়স পর্যন্ত তাহার কোন তত্ত্বই পান নাই;''[৩২]

বন্ধু ইন্দ্রের সান্নিধ্যেই সেই শৈশব থেকেই শ্রীকান্ত অন্তরে ধর্মসংস্কারের ঊর্ধ্বে মানবতাকে স্থান দিয়েছে। জীবনে সম্মুখীন বিভিন্ন মানুষের বিপদে দ্বিধাহীনভাবে যথাসাধ্য সহায়ের হাত বাড়িয়েছে। মানুষের অন্তরে প্রবেশ করার চাবিকাঠি পেয়েছে। জগৎ ও জীবনকে দেখার স্বচ্ছ চোখ লাভ করেছে। শ্রীকান্ত ইন্দ্রের সেই সহজ, অদম্য সাহসী স্বচ্ছ মনের পরোপকারীর মতো অদ্বিতীয় মানুষ আর জীবনে পায় নি। তাই দুঃখ প্রকাশ করে বলেছে —

> ''তার পরে কত কাল কত সুখ দুঃখের ভিতর দিয়া আজ এই বার্ধক্যে উপনীত

হইয়াছি। কত দেশ কত প্রান্তর, কত নদনদী, পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল, ঘাঁটিয়া ফিরিয়াছি, কত প্রকারের মানুষই না এই দুটো চোখে পড়িয়াছে, কিন্তু এত বড় মহাপ্রাণ ত আর কখনও দেখিতে পাই নাই। কিন্তু সে আর নাই। অকস্মাৎ একদিন যেন বুদ্‌বুদের মত শূন্যে মিলাইয়া গেল।"[৩৩]

সৃষ্টিকর্তার কাছেও শেষপর্যন্ত শ্রীকান্তের অভিযোগ —

"টাকাকড়ি, ধন-দৌলত বিদ্যাবুদ্ধি ঢের ত তোমার অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে দিতেছ দেখিতেছি, কিন্তু এত বড় একটা মহাপ্রাণ আজ পর্যন্ত তুমিই বা কয়টা দিতে পারিলে।"[৩৫]

এই মহাপ্রাণ ছেলেটির কর্মকাণ্ডের চাক্ষুষ দর্শনে শৈশবেই জীবনের বাস্তব ও সহজ সত্যকে উপলব্ধি করেছিল শ্রীকান্ত যা আজীবন তার অন্তরে, মানসে গ্রথিত ছিল। এই ভাবনারই ফলস্বরূপ জীবনে ছোট-বড় জাতিভেদ না করে বিচিত্র সব মানুষের জীবনের সংস্পর্শে আসতে পেরেছিল শ্রীকান্ত। তা না হলে ব্রাহ্মণত্বের রক্ত শরীরে নিয়ে শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধের বাঁধাবাঁধি, জন্মগত সংস্কারকে অতিক্রম করা হয়তো শ্রীকান্তের পক্ষে এত তাড়াতাড়ি সম্ভব হত না। বন্ধু ইন্দ্রের কাছ থেকেই শ্রীকান্ত নিজের বিবেক ও নৈতিকতা দিয়ে নিংড়ে নিয়েছিল মানবজন্মের সার্থক স্বরূপ মনুষ্যত্বের রূপটি। আর এই ইন্দ্রের সংস্পর্শে পরিচয় হয়েছিল শৈশবেই অন্নদাদিদির মতো ধৈর্যশীলা, সতী, এক নারীর সঙ্গে। যার জীবনবৃত্তান্ত, জীবনসত্য তার কাছে নারীর অভ্যন্তরীণ মহৎ স্বরূপটি চিনতে শিখিয়েছিল। শ্রীকান্ত কখনও নারীর কলঙ্কে নিরুচ্চারভাবে বিশ্বাস করতে পারেনি। নারীর কলঙ্কের অন্তরালে লুকায়িত বাস্তবকে বুঝতে চেয়েছে। সমাজ, পরিবেশ, পরিস্থিতির জাঁতাকলে তারা দুর্দশাগ্রস্ত ও কলঙ্কিত হয়েছে। কিন্তু তাদের অন্তরের সততা শ্রীকান্তকে মুগ্ধ করে। তাই শ্রীকান্ত বাইজী পিয়ারীর মধ্যে খুঁজে নিতে পারে প্রেমময়ী রাজলক্ষ্মীর রূপকে। পিয়ারী তার কাছে আজীবন রাজলক্ষ্মী হয়েই থাকে। অভয়ার বিদ্রোহ তাকে নাড়া দেয় কিন্তু অভয়াকে কলঙ্কিনী ভাবতে পারে না। অভয়ার বিদ্রোহের প্রতি নীরব স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয় তার মন।

বৈষ্ণবী কমললতার বিগত জীবনের কলঙ্কিত অধ্যায় জেনেও তার প্রতি অবজ্ঞা, ঘৃণা আসে না মনে। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের নারী চরিত্রগুলোর মধ্যে কলঙ্ককে অতিক্রম করে ফুটে উঠেছে মানুষের অন্তরের পবিত্রতম স্বরূপটি। সমাজের কাছে এরা কুলটা, নিগৃহীতা কিন্তু এই সমাজ সৃষ্ট বিধি-বিধানেই তারা এই

কলঙ্কে কালিমালিপ্ত হয়েছে। নারীর কলঙ্কে বিশ্বাস না করায় শ্রীকান্ত ঠকেনি বরং নারীর অন্তরের আসল পবিত্র স্বরূপটি উদ্ঘাটিত হয়েছে তার কাছে। শৈশবে অন্নদাদিদির স্নেহমণ্ডিত মূর্তির ভিতরের আসল স্বরূপটি জানতে পেরে শ্রীকান্ত আবিষ্কার করেছে অন্নদার সহ্যশীলা, পতিব্রতা তাপসী মূর্তিকে।

রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তের প্রেয়সী। তার মধ্যে মাতৃত্ব ও প্রেমের দ্বন্দ্বে ক্ষত বিক্ষত প্রেমের আসল স্বরূপের সন্ধান পেয়েছে। যে প্রেম কাছেই টানে না, কখনও দূরেও ঠেলে দেয়। অভয়ার মধ্যে রয়েছে ব্যক্তিত্বের চরম স্ফূরণ, সে সমাজেও ধর্মের বিধি বিধানকে লঙ্ঘন করেছে। কারণ বিবাহিত অন্যের স্ত্রী হয়েও রোহিনীর ভালবাসাকে সে অকপটে গ্রহণ করেছে। তার মধ্যে কপটতা ছিল না। কমললতা অল্পবয়সে বিধবা হয়েছে। জীবনে একটি ভুলের জন্য কলঙ্কিত হয়েছে। অবশেষে প্রায়শ্চিত্ত ও শান্তির খোঁজে বৈষ্ণবী হয়ে পথে পথে বেড়িয়েছে। কৃষ্ণের পদতলে নিজেকে সমর্পণ করেছে। এই পরিস্থিতিগুলো শ্রীকান্ত স্বচক্ষে উপলব্ধি করেছে বলেই তাদের আসল স্বরূপটি উদ্ঘাটন করতে পেরেছে। এর শিক্ষাও হয়েছিল শৈশবে অন্নদাদিদির জীবন বৃত্তান্তের অর্জিত অভিজ্ঞতায়। তাই কমললতার বহির্লোক ভেদ করে সে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে পৌঁছেছে তার অন্তর্লোকে। যেখানে প্রেমময়ী, সেবাব্রতী, পরমাত্মার কাছে নিবেদিতপ্রাণ কমললতার স্বচ্ছ, নিষ্পাপ মানুষটির দেখা মেলে।

আলোচ্য নিবন্ধের বিষয় আত্মজীবনীর উপন্যাসায়নকে ব্যাখ্যা করা। এখানে আমরা কোন শরৎচন্দ্রকে খুঁজে পাই তা নির্দিষ্টভাবে স্পষ্ট করতে হলে এর নারীচরিত্রগুলোর ভাবমূর্তির একটা বর্ণনা জরুরি। কারণ সমস্ত উপন্যাসেই সমাজে নিগৃহীতা কয়েকজন নারী নিজ নিজ ব্যক্তিত্ব নিয়ে বিরাজমান। সেই তুলনায় শৈশবের একমাত্র ইন্দ্র ব্যতীত কোন উজ্জ্বল দীপ্যমান পুরুষ চরিত্র নেই। তাই এর মূল সুরে বিধৃত রয়েছে নিগৃহীতা, নির্যাতিতা, নিষ্পেষিতা, কলঙ্কে কালিমালিপ্ত নারীর অবমাননার ইতিহাস। রক্ষণশীল সমাজ যাদের দূরে সরিয়ে রেখেছে সবসময়। নারীর প্রতি গভীর দরদ মমত্ব ছিল শরৎচন্দ্রের হৃদয় জুড়ে। তাই তাদের আসল স্বরূপটি তিনি স্পষ্ট করতে আগ্রহী।

শরৎচন্দ্র ছিলেন মানবতাবাদী, মানবদরদী লেখক। সমাজের জাতিভেদ, উঁচু নিচু মনোভাব, বিশেষভাবে নারীর বঞ্চনা তাঁকে ব্যথিত করে তুলেছিল। বহির্জীবন অপেক্ষা মানব মানবীর অন্তর্লোকের সত্যকেই বড় করে দেখেছেন যিনি। তাই সমাজে পতিতা, কলঙ্কিত নারীরাও তাঁর সাহিত্যে অন্তরের আপন ঔজ্জ্বল্যে দীপ্যমান হয়ে ওঠে। সমাজে, পরিবারে অবহেলিতা, নিগৃহীতা, পতিতা নারীর হৃদয়

বেদনা, কামনা-বাসনার দহন, প্রেম ও ত্যাগের ঔজ্জ্বল্য সুনিপুণ বিচার-বিশ্লেষণে প্রকাশ করেছেন। শরৎচন্দ্র নারীর অন্তর্দ্বন্দ্ব, অন্তর-রহস্য, নারীমনস্তত্ত্ব নিজের জীবন দিয়ে বুঝেছেন ও উপলব্ধি করেছেন। তাদের দেবীর আসনে বসিয়ে ভক্তি করেননি কিন্তু শ্রদ্ধা করেছেন। তাদের উপর নির্ভর করেছেন কিন্তু নিজের আত্মমর্যাদাবোধও অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। সামাজিক অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সব সময় আঘাত হেনেছেন সোচ্চারভাবে। প্রতিবাদ স্বরূপ বিভিন্ন নারী বিষয়ক সাহিত্য, প্রবন্ধ রচনায় কলম ধরেছিলেন।

শৈশবে কল্যাণময়ী অন্নদাদিদিকে শ্রীকান্ত ভালবেসেছে কিন্তু সঙ্গে ধর্মত্যাগিনী, কুলত্যাগিনী জেনে মেনে নিতে পারেনি। পরে অন্নদাদিদি শ্রীকান্তকে প্রেরিত পত্রপাঠে আসল সত্য জেনেছে। তখন কুলত্যাগিনী, সমাজ-নিগৃহীতা, পরিত্যক্তা অন্নদাদিদির মধ্যে আপন মনে সাধারণত তাপসী ও পতিব্রতা এক নারীসত্তাকে আবিষ্কার করেছে। অভয়ার বিদ্রোহ ও স্বাধীকার অর্জনের আত্মিক নির্ভীক ক্ষমতাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছে। এই নারীরা পরিস্থিতির বিপাকে, ভাগ্যের বিড়ম্বনায় কখনও পথ হারিয়ে বিপথে চললেও অন্তরের মাধুর্য হারায় না। এরই প্রমাণ রাজলক্ষ্মী, কমললতা। শরৎচন্দ্র সবসময় সতীত্বের চেয়ে মনুষ্যত্বকে বড় করে দেখেছিলেন। তাদের মনের মাধুর্যকে মানবিক গুণাবলিকে সাহিত্যে উদ্ঘাটন করেছিলেন।

'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্বের প্রথমাংশে শৈশবের স্মৃতিচারণায় অন্নদাদিদির সঙ্গে পাঠকের পরিচয় হয়। এই রমণী শ্রীকান্তের মনে সারাজীবন থেকেছে শ্রদ্ধার আসনে। বিদ্যুতের ক্ষণপ্রভার মত একটু সময়ের মধ্যেই শ্রীকান্তের চেতনা মনকে আলোকিত ও আলোড়িত করে গেছেন সারাজীবনের জন্য। সারাজীবন নারীজাতির কলঙ্কের আবরণকে ঠেলে অন্তর্লোকের সত্যটি উপলব্ধি করার দৃঢ় মানসিকতা গঠনে অন্নদাদিদির প্রভাব ছিল অপরিসীম। অন্নদাদিদির সমাজের নিয়ম মেনেই বাল্যকালেই বিয়ে হয় কুলধর্ম রক্ষা করতে। স্বামী ব্রাহ্মণ শ্বশুরালয়েই আশ্রিত কিন্তু সে একদিন অন্নদার দিদিকে খুন করে পালিয়ে যায়। বহুকাল পরে সে সাপুড়ে শাহজীর ছদ্মবেশে অন্নদার বাড়ির সামনে সাপের খেলা দেখাতে আসে। অন্নদা তাকে চিনতে পেরে খুনী খল স্বামী শাহজীর সঙ্গেই ঘর ছাড়ে। সমাজের পঠিত মন্ত্রে দীক্ষিত অন্নদা পাতিব্রত্যের একনিষ্ঠায় দুঃখপূর্ণ ঝুঁকিপূর্ণ জীবনকে সাদরে গ্রহণ করে বেরিয়ে যায়। কিন্তু সমাজ, ঘর, পরিবার সবাই তাকে কুলটা, কুলত্যাগিনী বলে জানে। আসল সত্যটিকে শ্রীকান্ত ব্যতীত কেউ কোনোদিন জানল না। সারাজীবন কুলটা, কলঙ্কিনী রূপে নিজেকে অন্নদা আত্মবঞ্চনা করেছে। দুর্নাম গ্রহণ করে, বেদনাবিধুর জীবন কাটিয়ে গেল ত্যাগের এই মহিমান্বিত মূর্তি। ইন্দ্র যখন লম্পট খল স্বামীর মৃত্যুর পর অন্নদাদিদিকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল

তখন দিদি বলেছিলেন স্বামীর ধার দেনা রয়েছে, তা শোধ না করে কী করে যাবেন।

> ইন্দ্র বলেছিল, — ''তুমি চল আমার সঙ্গে। কে তোমাকে আটকায় দেখি একবার।' অন্নদা বলেছিল — 'ওরে পাগলা, যে আমাকে আটক করে রাখবে, সে যে আমার নিজেরই ধর্ম।''[৩৫]

আজকের আধুনিক চিন্তাধারায় হয়তো অন্নদাদিদির এই উক্তির কোনো মানে নেই। কিন্তু সামাজিক, ধার্মিক নিয়ম নিষ্ঠার শেকলে বাঁধা দিদি শুধু দেনার দায়ে ধর্ম পালনের কথা তো বলেননি। এই নিজের স্বামীধর্মই তো তাকে খল, পাপী শাহজীর কাছে সমর্পিত থেকে জীবনত্যাগে প্রেরণা দিয়েছিল।

নারীদরদী শরৎচন্দ্র শ্রীকান্তের ভাষ্যেই প্রশ্ন তুলেছেন সমাজের কাছে। কারণ অন্নদাদিদির মতো নারীদের কুলরক্ষার নামে বাল্যবিবাহ দেওয়া হয় অপাত্রে। আবার পতিই পরমেশ্বর মন্ত্রটি মনে, প্রাণে, মস্তিষ্কে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। যা রক্তে, ধমনীতে নিমজ্জিত হয়ে যায়। এই মন্ত্রের আকর্ষণেই পরিস্থিতির বিপাকে তারা কুলত্যাগিনী হতে বাধ্য হয়। সমাজ জেনে শুনেই নারীকেই কলঙ্কিনী আখ্যা দেয়। দোষারোপ করে দণ্ড দেয়।

শৈশবে শ্রীকান্ত পত্র মারফৎ অন্নদাদিদির সরল, সত্যনিষ্ঠ ভিতরকার সত্যটি অবগত হয়। তাই সে অভিযোগের সুরে বলে —

> ''কিসের জন্য এতবড় সতীর কপালে অসতীর গভীর কালো ছাপ মারিয়া চিরদিনের জন্য তাঁকে তুমি সংসারে নির্বাসিত করিয়া দিলে? কি না তুমি তাঁর নিলে? তাঁর জাতি নিলে, ধর্ম নিলে, সমাজ, সংসার, সম্ভ্রম সমস্তই নিলে? দুঃখ যত দিয়াছ, আমি তো আজো তাহার সাক্ষী রহিয়াছি। এতেও দুঃখ করি না, জগদীশ্বর। কিন্তু যার আসন সীতা, সাবিত্রী, সতীর সঙ্গেই তাঁকে তাঁর বাপ, মা, আত্মীয় স্বজন, শত্রু, মিত্র জানিয়া রাখিল কি বলিয়া? কুলটা বলিয়া, বেশ্যা বলিয়া? ইহাতে তোমারই বা কি লাভ? সংসারই বা পাইল কি?''[৩৬]

নারীদরদী, সমাজ পর্যবেক্ষক শরৎচন্দ্রের এই দরদ তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির ফসল। তাঁর শ্রেষ্ঠ জীবনভাষ্যের ঔপন্যাসিক প্রতিবেদনে কথক শ্রীকান্তের মাধ্যমে যা আত্মপ্রকাশ করেছে। এই সত্যপোলব্ধি

থেকেই তাঁর মর্মবাণী বেরিয়ে আসে —

> ‘‘তাই ভাবি, না জানিয়া নারীর কলঙ্কে অবিশ্বাস করিয়া সংসারে বরঞ্চ ঠকাও ভাল, কিন্তু বিশ্বাস করিয়া পাপের ভাগী হওয়ায় লাভ নেই।’’[৩৭]

অন্নদাদিদির জীবনসত্যের উন্মোচনে, সত্যোপলব্ধিতে, অভিজ্ঞতায় শ্রীকান্ত ভবঘুরে জীবনে বিভিন্ন নারীর সংস্পর্শে এসেছে। তাদের দুঃখকে অনুভব করেছে সহমর্মিতা দিয়ে। তাদের কলঙ্কে ঘৃণা করতে পারেনি। বরং সমাজের ব্যভিচারে নির্যাতিতা, নিয়মের বিধানে বঞ্চিতা নারীদের জন্য ব্যথিত হয়েছে তার হৃদয়। শ্রীকান্ত উপন্যাসে রাজলক্ষ্মী সমস্ত উপন্যাস জুড়ে বিচরণ করেছে। কুমার সাহেবের পার্টিতে শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীকে আবিষ্কার করে। রাজলক্ষ্মী ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে আজ পিয়ারী বাঈজীতে পরিণত। এই পিয়ারী শ্রীকান্তের বাল্য-প্রেয়সী রাজলক্ষ্মী। সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যেও কিন্তু রাজলক্ষ্মী প্রথম প্রেমকে, নিজের মনের মাধুর্যকে বিনষ্ট হতে দেয়নি। মনের গভীরে তপস্যা করে গেছে একনিষ্ঠ প্রেম বাঁচিয়ে রেখেছে। যা শ্রীকান্ত সমস্ত জীবন জুড়ে অনুভব করেছে।

শ্রীকান্তের জীবনে বিশেষ আর এক নারী অভয়া। যে নিজের নামকে সার্থক করে তুলেছে বিদ্রোহের অগ্নিশিখায়। সে বিয়ের অর্থহীন আবৃত্তি করা মন্ত্রকে অস্বীকার করে, লম্পট, বর্বর, অত্যাচারী স্বামীকে ত্যাগ করেছে। প্রেমের অভীঃমন্ত্রের দীপ্তিতে প্রেমিক রোহিনিকে স্বীকার করেছে। এখানে তার দুঃসাহসিক সংস্কারমুক্ত মানসিকতার পরিচয় ফুটে উঠেছে যা তৎকালীন সমাজে অসম্ভব ছিল। যদিও অভয়ার এই জীবনযাপনের সিদ্ধান্ত বাংলার বাইরে রেঙ্গুনে ঘটেছে। অভয়া বাংলাদেশের অসহায় মেয়ে, বাপ নেই, মা মরেছে, শ্বশুরবাড়ির ভিটে চেনে না। অনেক বৎসর থেকে স্বামী নিরুদ্দেশ। তাই অভয়া বাধ্য হয়ে স্বামীর খোঁজে রোহিনির সঙ্গে রেঙ্গুন এসেছে। শ্রীকান্তের সাহায্যে স্বামীকে খুঁজে পেয়ে তার কাছেও গিয়েছে কিন্তু স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করে বর্মায় ছেলেমেয়ে নিয়ে বাস করছে। অভয়াকে ফুসলিয়ে নিয়ে গিয়ে রোহিনির সঙ্গে আসার কৈফিয়ত চেয়ে স্বামীত্বের অধিকারে নির্মম, বর্বর অত্যাচার চালিয়েছে। জন্ম-জন্মান্তরের অন্ধসংস্কারবশে সে স্বামী ও সতীনকে স্বীকারও করে নিয়েছিল। কিন্তু স্বামীর বর্বর অত্যাচারে, তার সতীত্বে সংশয় প্রকাশ করায় ঘৃণায় স্বামীকে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছে। অভয়া, শ্রীকান্তকে বলেছে—

> ‘‘স্বামী যখন সুদ্ধমাত্র একগাছা বেতের জোড়ে স্ত্রীর সমস্ত অধিকার কেড়ে নিয়ে তাকে অন্ধকার রাত্রে একাকী ঘরের বার করে দেন, তার পরেও বিবাহের

বৈদিক মন্ত্রের জোড়ে স্ত্রীর কর্তব্যের দায়িত্ব বজায় থাকে কি না, আমি সেই কথাই তো আপনার কাছে জানতে চাইছি।"[৩৮]

এই জানতে চাওয়া তো শুধু অভয়ার নয়। শ্রীকান্তের স্রষ্টা শরৎচন্দ্রেরও জিজ্ঞাসা সমাজ বিধি নির্মাণকারীদের কাছে। বাংলাদেশে ভবঘুরে জীবনে জীবিকার সন্ধানে দেশ, বিদেশ, ছোট-বড় যত জায়গায় গেছেন তার চোখে পড়েছে নারীর বঞ্চনা, অবমাননা। আর তার কারণ হচ্ছে হিন্দুধর্মের এই অন্ধ সংস্কার। বাল্যবিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ কোন বালিকা যে ব্রাহ্মণ বৃদ্ধ স্বামীকে কখনও দেখেনি। কিন্তু সারাজীবন পত্নীর ধর্ম, সতীত্ব রক্ষায় বিধবা হয়ে বঞ্চনা স্বীকার করতে বাধ্য। এখানে অভয়ার বিদ্রোহ কেউ উদারভাবে যে মেনে নিতে পারে না তাও শ্রীকান্ত অনুভব করেছে —

"যে অন্ধ সংস্কারের ফল বলিয়া অভয়া আমাকে দেখিবা মাত্রই ছুটিয়া লুকাইয়াছিল, সে সংস্কার ত আমারও ছিল! আমিও ত তাহার অতীত নই।' সুতরাং বেশ করিয়াছ — একথাও বলিতে পারিলাম না, অপরাধ করিয়াছ — এমন কথাও মুখ দিয়া বাহির হইতে চাহিল না। অপরের একান্ত সংকটের কালে যখন নিজের বিবেক ও সংস্কারে, স্বাধীন চিন্তায় ও পরাধীন জ্ঞানে সংঘর্ষ বাধে, তখন উপদেশ দিতে যাওয়ার মত বিড়ম্বনা সংসারে অল্পই আছে।"[৩৯]

কিন্তু সমাজ নির্মিত শৃঙ্খলে, বিবাহের মন্ত্রবলে বর্বর, লম্পট, স্বামীদের অত্যাচার সহ্য করে যাওয়াও যে একপ্রকার সমাজ স্বীকৃত গণিকাবৃত্তি এই বিবেচনার ভাষা অভয়ার মুখেই বসিয়েছেন —

"আমাকে যিনি বিয়ে করেছিলেন তাঁর কাছে না এসেও উপায় ছিল না, আর এসেও উপায় হল না। এখন তাঁর স্ত্রী, তাঁর ছেলেপুলে; তাঁর ভালবাসা কিছুই আমার নিজের নয়। তবুও তারই কাছে তাঁর একটা গণিকার মত পড়ে থাকাতেই কি আমার জীবন ফুলে-ফলে ভরে উঠে সার্থক হতো শ্রীকান্তবাবু?"[৪০]

তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায়, একজন বাঙালি মননের হিন্দু সংস্কারে আবদ্ধ নারীর পক্ষে এই মানসিকতা যেমন দুরূহ। তৎকালীন সাহিত্যেও অভয়ার মতো দুঃসাহসী আধুনিক মানসিকতার নারীও দ্বিতীয়রহিত।

আজকের আধুনিক সমাজে প্রচলিত 'Live together' বা বিবাহ বহির্ভূত 'একত্রে-বাস' করার আধুনিক মানসিকতা দূরদর্শী চিন্তাধারী শরৎচন্দ্রের পক্ষেই সম্ভব ছিল। যার জন্য তাঁর সময়ে তাঁকে অনেক নিন্দা ও ভর্ৎসনা সহ্য করতে হয়েছিল।

শরৎচন্দ্রের সমাজচেতনার মূলে আছে নিজের জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা। দৈন্য, দুঃখ কষ্ট, অবহেলা অপমানে বিশেষ করে প্রথম জীবনের তিক্ত ঘটনাবলী তাঁকে বেদনাহত, অস্থির, বিদ্রোহী করে তুলেছিল। জীবনের কদর্য বাস্তব অভিজ্ঞতার ফলে তিনি মানুষের অন্তরস্থিত মনুষ্যত্বকে চিনেছেন। তাই তিনি সতীত্ব, পাপ, উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ অতিক্রম করে মনুষ্যত্বের জয়গান করেন। মানবিক অধিকার এবং মনুষ্যত্বের গুণকেই তিনি সর্বাগ্রে প্রতিষ্ঠা দিতে আগ্রহী। তাই তৎকালীন সমাজেও অভয়ার মুখে উচ্চারণ করাতে পারেন বিবাহ বহির্ভূত সন্তানও যে পবিত্র মানবেরই অংশ। —

> ''আমাকে আপনি যা ইচ্ছা হয় ভাববেন, আমার ভাবী সন্তানদের আপনারা যা খুশী বলে ডাকবেন, কিন্তু যদি বেঁচে থাকি শ্রীকান্তবাবু, আমাদের নিষ্পাপ ভালবাসার সন্তানরা মানুষ হিসাবে জগতে কারও চেয়ে ছোট হবে না — তাদের দিয়ে যাবার মত জিনিস তাদের বাপ মায়ের হয়ত কিছুই থাকবে না; কিন্তু তাদের মা তাদের এই বিশ্বাসটুকু দিয়ে যাবে যে, তারা সত্যের মধ্যে জন্মেছে, সত্যের বড় সম্বল সংসারে আর কিছু নেই।"[৪১]

শরৎচন্দ্র যে কোনো অবস্থায়, পরিবেশে, পরিচয়ে মানুষকে পাপী, অপবিত্রের চেয়ে মানুষ হিসেবেই মর্যাদা দিতে আগ্রহী। এরই প্রত্যয়বাণী অভয়ার মুখে উচ্চারণ করেন। মানুষ হিসেবেই পরিচয় যে বড় অভয়ার এই আত্মবিশ্বাসের ভাবী স্ফুরণই বোধ হয় দেখা যায় শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্রশ্নে'। এই উপন্যাসের নায়িকা কমল বিবাহ বহির্ভূত মা-বাবার সন্তান। সে এই বিষয়ে কোনও গ্লানি মনে করে না। নিজেকে 'সত্যকুলজাত' ভাবে এবং ব্যবহারে ও বাক্যে ফুটিয়ে তোলে নির্মল সৌন্দর্য ও পবিত্রতা। অন্য কোনো পরিচয়েই তার আর আগ্রহ নেই। এভাবেই 'কমল' হয়ে উঠেছে শরৎসাহিত্যে, মননে ও ধ্যানে সেই সময়ের অনাগত নতুন পৃথিবীর মানবী।

শ্রীকান্তের নিরুদি যিনি স্নেহপরায়ণা, পরোপকারী, নিরীহ মানবী। পাড়ার সকল অসহায় মেয়েদের হাতের বিদ্যা শিখিয়ে কোনো না কোনোভাবে সাহায্য করেছেন। পাড়াপড়শি মানুষের বিপদে, রোগে,

শোকে এই শান্ত স্বভাবের রমণী সকলের প্রতি সেবা ও সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন। কিন্তু দীর্ঘ রোগশয্যায় পরে মৃত্যুকালে পাড়া-পড়শির কারো দেখাও পাননি। এই সময়টারও সাক্ষী শ্রীকান্ত। নিরুদির এই অসহায়ত্বে বিপদের বেলায় শ্রীকান্ত ও তার পিসিমাই সাহায্যের হাত বাড়িয়েছিল। শ্রীকান্তের আত্মা অনুতাপ করেছে—

> ''দোষস্পর্শলেশহীন নির্মল হিন্দুসমাজ হতভাগিনীর মুখের উপরেই তাহার সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করিয়া দিলেন। সুতরাং যে পাড়ার মধ্যে এমন একটি লোকও বোধ করি ছিল না, যে কোনো না কোনো আকারে নিরুদিদির সযত্ন সেবা উপভোগ করে নাই।''[৪২]

প্রথম পর্বের এগারো তম পরিচ্ছেদে শ্রীকান্ত শান্তির খোঁজে সন্ন্যাস গ্রহণ করে দীক্ষা নিয়েছে। সন্ন্যাসজীবনে একদিন ভিক্ষা করতে করতে একটি বাড়িতে উপস্থিত হয়ে দেখতে পান ছোট একটি হিন্দুস্থানী বধূকে। ভিক্ষা চাওয়াতে শ্রীকান্তের মুখে বাংলাভাষা শুনে সেই ছোট বধূটি কেঁদেই ফেলল। শ্রীকান্তকে কত প্রশ্ন করতে থাকল, — 'তুমি কোথা থেকে আসছ? তুমি কোথায় থাক? তোমার বাড়ী কি বর্ধমান জেলায়?' ইত্যাদি— এই ছোট বধূটির দুঃখ ক্লেশযুক্ত চেহারায় তার যন্ত্রণার আর্তি, দেশে ফেরার হাহাকার দেখে শ্রীকান্ত দুঃখিত হয়। মেয়েটির কাছে শ্রীকান্ত জানতে পারে, সে জনৈক গৌরী তেওয়ারীর ছোট মেয়ে। তারা গ্রাম বাংলার লোক, দেশে তাদের জাতের লোক পাওয়া যায় না। তাই এই দূর দেশে পিতা তাদের দুই বোনের বিবাহ দিয়েছেন। এই সমাজের সঙ্গে তাদের ভাষা, আচার, সংস্কৃতি মেলে না। এখানে নানা কারণে তারা অসহায় হয়ে পড়েছে। তাদের উপর নির্মম অত্যাচার করা হয় প্রতিনিয়ত। বড়দিদি অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে মানসিক যন্ত্রণায় গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে পরিত্রাণ পেয়েছে। আর সে দিনরাত নির্মম যন্ত্রণা সহ্য করে যাচ্ছে। শ্রীকান্ত যেন তার পিতার কাছে খবর পৌঁছে দেয় এই করুণ অনুরোধ রাখে। শ্রীকান্তের ব্যথিত হৃদয় সমাজের নিয়ম-বিধানে গর্ববোধ করতে পারে না। তার ব্যথিত হৃদয় বলে ওঠে, —

> ''যে সমাজ এই দুটি নিরুপায় ক্ষুদ্র বালিকার জন্যও স্থান করিয়া দিতে পারে নাই, যে সমাজ আপনাকে এতটুকু প্রসারিত করিবার শক্তি রাখে না, সে পঙ্গু আড়ষ্ট সমাজের জন্য মনের মধ্যে কিছুমাত্র গৌরব অনুভব করিতে পারিলাম না।''[৪৩]

এই উপন্যাসের আরেক নিগৃহীতা নারী কমললতা বৈষ্ণবী। বৈষ্ণবী হওয়ার পূর্বের নাম ছিল ঊষাঙ্গিনী। সতেরো বৎসর বয়সে সে বিধবা হয়। কলকাতায় বাবার ব্যবসা ছিল সেও সেখানে থাকত। সে সময় তাদের সরকার মন্মথ এর সঙ্গে যৌবনের কামনা বাসনায় কমললতার অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। একুশ বৎসর বয়সে সে সন্তানসম্ভবা হয়। এই ঘটনায় প্রাণের অত্যধিক ভালবাসার মানুষটির আসল ছলনাময় রূপটি সামনে আসে। মন্মথ প্রথমে বৈষ্ণব মতে কণ্ঠীবদল করে বিয়েতে রাজি হয় দশ হাজার টাকার বিনিময়ে। কিন্তু অধিক লোভের তাড়নায়, তার অপরাধ ভাইপো যতীনের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে বিশ হাজার টাকা দাবি করে। যতীন কমললতার বাবার সাহায্যে পড়াশোনা করত তাদের বাসায় থেকে। মিথ্যা অপবাদে, অপমানে, ঘৃণায় যতীন সে রাত্রেই আত্মহত্যা করে। কমললতা পরে একটি মৃত সন্তানের জন্ম দেয়। নিজে পরিতাপে দগ্ধ হয়ে জীবিত অবস্থায় ঊষা মরেছে বলে প্রচার করে, বাড়িতে ফিরিয়ে দেয় বাবাকে। যতীনের আত্মহত্যার জন্য দায়ী মনে করে এই অপরাধে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ, মন্মথের প্রতি ঘৃণায় ঊষার আত্মিক মৃত্যুতে জন্ম নেয় বৈষ্ণবী কমললতা। সে দেশছাড়া, ঘরছাড়া হয়। পথে পথে শান্তি খুঁজেছে ঘর-সংসার-সমাজ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ভগবানের শ্রীচরণে নিজেকে সমর্পণ করেছে। শ্রীকান্তকে সে বলে —

> ‘‘ঘর আমার গাছতলায়, দেশ আমার পথে পথে।’’[৪৪]

এভাবে আমরা নানা পরিবেশে - নানা পরিস্থিতিতে নারীর কলঙ্কের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। কিন্তু তাদের জীবনবৃত্তান্তের অন্তর্লোকে রয়েছে মনুষ্যত্বের বড় পরিচয়। শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন এরা সমাজের বিধি নিয়মের ফলেই ভাগ্যবিড়ম্বিতা, নিগৃহীতা, নির্যাতিতা, বঞ্চিতা। কারণ এরা সবাই কেউ বাল্যবিধবা, কেউ বিবাহিতা কিন্তু গ্লানিময় জীবন ধারণ করতে বাধ্য। সমাজে পরিবারে মানুষের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত কিন্তু ধর্মের নামে সংস্কারের ঘেরাটোপে আবদ্ধ। সমাজ তাদের অধিকার থেকে, নারীমূল্য থেকে বঞ্চিত করে আবার তাদের ভাগ্য বিড়ম্বনার ফলে ঘটা বিপদে তাদের পুনর্বাসন দেয় না। তাই বাধ্য হয়ে পতিব্রতার মন্ত্রে দীক্ষিত নারী অন্নদা সতীত্ব রক্ষায় নিঃশব্দে কুলত্যাগ করে কলঙ্কিনী আখ্যা পায়। রাজলক্ষ্মী অন্তর্লোকে প্রেম মাধুর্যকে জীবিত রেখে বহির্জীবনে বাইজী বেশ ধারণ করে। অভয়া দেশত্যাগ করে ধর্ম বিধান বিবাহের অর্থহীন মন্ত্রকে অবলীলায় অস্বীকার করে। কমললতা সংসার, সমাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে পারলৌকিক ঈশ্বরের খোঁজে পথে পথে নিজেকে সমর্পণ করে। আর গৌরী তেওয়ারীর মেয়েরা জীবনত্যাগ করে পরলোকে

আশ্রয়ের সন্ধান করে। কারণ দোষস্পর্শলেশহীন সমাজ তাদের দ্বার নিষিদ্ধ করে দেয়। বাঁচার লড়াইয়ে, শান্তির খোঁজে, আশ্রয়ের সন্ধানে, প্রায়শ্চিত্তের কামনায় কে কোন পথে নিজেকে সার্থক করে তুলতে চায় তা নির্দিষ্ট নয়। তাই 'শ্রীকান্তে'র অভয়ার ব্যক্তিগত অনুভবের ভাষা—

> ''সংসারে সব নর-নারীই এক ছাঁচে তৈরি নয়, তাদের সার্থক হবার পথও জীবনে শুধু একটা নয়। তাদের শিক্ষা, তাদের প্রবৃত্তি, তাদের মনের গতি কেবল একটা দিক দিয়েই চালিয়ে তাদের সফল করা যায় না। তাই সমাজে তার ব্যবস্থা থাকা উচিত।''[৪৫]

শ্রীকান্ত উপন্যাসে আরেক বিদূষী বিদ্রোহী নারী চরিত্র সুনন্দা। সুনন্দা এই উপন্যাসে রাজলক্ষ্মী, অন্নদাদিদি, অভয়া বা কমললতার মতো সমাজ নির্যাতিতা, নিগৃহীতা নয়। সে দরিদ্র শাস্ত্রীয় পণ্ডিতের মেয়ে। বাবা কাশী যাত্রাকালে তার দায়িত্ব দিয়েছেন শিষ্য যদুনাথ কুশারীকে। সে যদুনাথের স্ত্রী রূপে গঙ্গামাটি গ্রামের কুশারী বাড়ির বধূ। সুনন্দার ভাসুর কাশীনাথ কুশারী রাজলক্ষ্মীর গঙ্গামাটির বিষয়-সম্পত্তির গোমস্তা। কাশীনাথ দরিদ্র বিধবা তাঁতি বৌ ও তার ছেলেকে প্রতারণা করে অঢেল বিষয়-আশয় করেছে। সুনন্দা এই কথা জানতে পেরে ভাসুর ও জা কে বিনীত প্রার্থনা করে, —

> ''এ বিষয় যার তাকে যদি ফিরিয়ে না দেন তো আমি বেঁচে থেকে এই মহাপাপের একটা অন্নও আমার স্বামী পুত্রকে খেতে দিতে পারব না।''[৪৬]

আর সে নিজের পণ রক্ষায় প্রবল দারিদ্র্যকে গ্রহণ করে স্বামী পুত্র নিয়ে গৃহত্যাগ করে। এখানে সে নিজেকে ঐশ্বর্যশালী জীবন থেকে সরিয়ে নিয়ে দারিদ্র্য বরণ করে নিজেদের নির্যাতন করেছে। কারণ তার সততা, ন্যায়িক জ্ঞান ও সবচেয়ে বড় মনুষ্যত্বের কাছে সে দায়বদ্ধ। সে এখানে সমাজের প্রভুত্বরূপী জমিদারি শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। ব্যক্তিস্বার্থে নয়, প্রজাস্বার্থের পক্ষে। যা শ্রীকান্তের চিত্তকে আলোড়িত করেছে।

> ''আপনাকে আপনি বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাই, যে কয়টি নারী-চরিত্র আমার মনের উপর গভীর রেখাপাত করিয়াছে, তাহার একটি সেই কুশারী মহাশয়ের ভ্রাতৃজায়া। এই সুদীর্ঘ জীবনে সুনন্দাকে আমি আজও ভুলি নাই।''[৪৭]

শরৎচন্দ্র বাস্তব জীবনে ছিলেন অত্যন্ত নারীদরদী। বিস্তৃত ভবঘুরে জীবনে তার সাক্ষাৎ হয়েছে

বিভিন্ন নারীর সঙ্গে। তাদের স্নেহ, মমতা, ভালবাসা কুড়িয়েছেন পথে পথে। আত্মিক দরদ এবং নিবিড় সান্নিধ্যে তাদের অন্তর্লোকে প্রবেশ করে বিভিন্নভাবে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। বিভিন্ন সংকটে, অনেক সময় নারীর প্রতি নির্ভরশীল হতেও হয়েছে। আতিথ্য গ্রহণ করতে হয়েছে। শরৎচন্দ্র ছিলেন অত্যন্ত সমাজ-সচেতন লেখক। এই সমাজ-চেতনার বিশাল অধ্যায় জুড়ে আছে নারীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাচেতনা। নারীর অন্তর্লোকের গভীর ব্যথা, সমবেদনা ও অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বুঝেছেন। তাদের অন্তর-রহস্য, নারী মনস্তত্ত্ব নিজে অনুভব ও উপলব্ধি করেছেন। জীবনচেতনার সুগভীর অভিজ্ঞতায় ও সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণে উপন্যাসে-গল্পে সমাজের অচল-অনড় স্বরূপ ও নারীর জীবনকে জীবন্ত করে চিত্রায়িত করে গিয়েছেন। এখানেই তিনি অবহেলিত, শোষিত, নির্যাতিত নারী ও সমাজের দরিদ্র সাধারণ মানুষের যথার্থ মানবদরদী ও সমাজতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষক রূপে অগ্রগণ্য।

শরৎচন্দ্রের জীবনে জুটেছে বিভিন্ন নারীর সান্নিধ্য। তেমনি তাঁর সাহিত্যে, গল্পে, উপন্যাসের প্রধান বিষয়ে আছে নারীর বহুমাত্রিক অবস্থানের বর্ণনা। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের বিচিত্র ভাণ্ডারে আমরা দেখেছি সমাজ নিগৃহীতা পতিতা নারীর হৃদয় বেদনা। তাদের কামনা-বাসনা, জীবনের দাহযন্ত্রণা। প্রেমের মাধুর্য ও বঞ্চনার দাহকে অত্যন্ত সহানুভূতি, মর্মস্পর্শী হৃদয় দিয়ে সুনিপুণ বিশ্লেষণে প্রকাশ করেছেন লেখক। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের নারীদের প্রেম সমাজ-স্বীকৃত পথ অমান্যতার দায়ে বেদনাবিধুর। কিন্তু এরাই ঔপন্যাসিকের স্বচ্ছ মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির আতস কাঁচে মনুষ্যত্বের গরিমা অর্জন করেছে। ঔপন্যাসিক এদের মধ্য দিয়েই দেখালেন সমাজের অন্যায়, অবিচার। সমাজ নির্ধারিত সতীত্বের সংজ্ঞার পরিবর্তে মানবিক মূল্যবোধের স্বচ্ছ জ্ঞানের আলোকবর্তিকা প্রজ্বলন করলেন। শরৎচন্দ্র বলেছিলেন—

> ''সতীত্বকে আমি তুচ্ছ বলিনে, কিন্তু একেই তার নারীজীবনের চরম ও পরম শ্রেয় জ্ঞান করাকেও কুসংস্কার মনে করি।''[৪৮]

ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র ছিলেন ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের বাসিন্দা। পরাধীন ভারতবর্ষের করুণ অবস্থা এই দেশপ্রেমিককে, বেদনাবিহ্বল করে তুলত। পরাশ্রয়ে গ্লানিকর জীবনের বেদনা যিনি শৈশবেই উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর শিল্পীমন ও আত্মাকে ঔপনিবেশিক ভারতে পরাশ্রয়ের বেদনা আরও গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছিল। তাই তাঁর সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে দেশের পরাধীনতার মূল কারণ। একটি ব্যক্তিগত কথোপকথনের দৃষ্টান্ত থেকে আমরা বুঝতে পারব নারীর বঞ্চনার গূঢ় তত্ত্বটি কীভাবে দেশের সঙ্গে জড়িত।

নারীকে অবমাননা, বঞ্চনা করাই সমাজের বড় ভুল। ফলে সমাজ ও সমাজের এই ভুলের ফলেই যে দেশও আজ লাঞ্ছিত ও পরাধীন ইংরেজের হাতে। ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায় একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী, যিনি শরৎচন্দ্রের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। সে সময় তিনি 'চলার পথে' বই লিখে বাংলার মেয়েদের বিপ্লব-পন্থিনী হতে আহ্বান করেন। এই বইয়ের ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র। এই 'চলার পথে' প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করেই শরৎচন্দ্র দেশের লাঞ্ছনা ও নারীর লাঞ্ছনার মূলের গূঢ় তত্ত্বকে উদ্ঘাটন করেন। তিনি ভূপেন্দ্রকিশোরকে বলেছিলেন —

> ''দ্যাখো, এ দেশটাকে আমি ভালোবাসি। ... দ্যাখো, এদেশটাকে গভীর করে আমি দেখেছি। এর মানুষগুলো আমার পরিচিত। শুধু বাংলা নয়, এই ভারতবর্ষ কবে থেকে মরতে বসেছে জানো? যেদিন থেকে এর পুরুষগুলো হয়েছে স্বার্থপর। এরা ষড়যন্ত্র করল, মেয়েজাতটার বিরুদ্ধে। মেয়েদের ভক্তি করা শুরু করল এরা কথায়, কিন্তু ঘৃণা করতে আরম্ভ করল কাজে। ফল, কল্পনার জগতে নারী পেল দেবীর আসন, কর্মজগতে স্থান হল তার হেঁসেলে। ও দুটোর কোনটাই নারীর অর্জিত বস্তু নয় — পুরুষ রচনা করল শাস্ত্র। পুরুষ বানাল বিধান। সেই শাস্ত্র ও বিধান অপৌরুষেয় আদেশ হয়ে বেঁধে ফেলল নারীকে ন্যুব্জ করে। পুরুষ-রচিত পঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করে নারীও যেদিন গর্ববোধ করল তার দেবী মাহাত্ম্যে, সেদিন থেকে নাভিশ্বাস উঠে গেছে জাতির। .... বহু ত্রুটির মাঝে অন্যতম ত্রুটি হল নারীর প্রতি আমাদের ব্যবহার, তাদের সম্বন্ধে ধারণা। .... যা সত্য তা প্রত্যেক মানুষের জন্যই সত্য, — দেশটা পুরুষের পক্ষে যতটুকু সত্য, মেয়েদের পক্ষেও ততটুকুই সত্য। ... সমাজের দুর্বুদ্ধি যেদিন থেকে নারীকে অস্বাভাবিক চরিত্রে পেতে চাইল, সেদিন থেকে মরে গেল নারীর প্রাণ, মরে গেল পুরুষের পৌরুষ। ... নারী ও শূদ্রকে অপাংক্তেয় করে রেখে যে মুষ্টিমেয়র দল গোটা জাতের উপর প্রভুত্ব করতে চেয়েছিল, তাদের অদৃষ্টে পরের দাসত্বভোগ যে অলঙ্ঘ্য ঐতিহাসিক সত্য।''[৪৯]

এই সূক্ষ্ম চিন্তাচেতনাটুকুই তো তাকে সমাজতাত্ত্বিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ করে। বিভিন্ন জনের সঙ্গে কথায়,

আলোচনায় তাঁর ভাব ব্যক্ত হয়। এই বিচার-বিশ্লেষণের একটি সূত্র দৃষ্টিগোচর হয় 'শ্রীকান্ত'-এ রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্তের কথোপকথনে। শ্রীকান্ত বলেছিল —

> ''আমরা প্রভু, তোমরা দাসী, এই সংস্কারটাই এদেশের মেয়েদের মনে এমনি বদ্ধমূল যে, এর হীনতাটাও আর তোমাদের চোখে পড়ে না। বোধ করি এই পাপেই পৃথিবীর সকল দেশের মেয়ের চেয়ে তোমরাই আজ ছোট হয়ে গেছ। রাজলক্ষ্মী বলল — তোমরাই তাদের ছোট মনে ক'রে ছোট করে দিয়েছ নিজেরাও ছোট হয়ে গেছ। এই সত্যি কথা।''[৫০]

সমাজেরই উচ্চবর্ণের পুরুষরা বিধি-বিধান, শাস্ত্র, সংস্কার তৈরি করেছিল। যার মধ্যে বহু অমানবিক কুসংস্কারও ছিল। ফলে রামমোহন, বিদ্যাসাগরকে যুগব্যাপী সংগ্রামী পদক্ষেপে সমাজের অন্তর্জাগরণে দুর্বিষহ সংঘাত করতে হয়েছিল। কিন্তু সমাজের বদ্ধমূলে নিহিত জাতি-ভেদাভেদের অহং এত তাড়াতাড়ি অবলুপ্ত হয়নি। সে-সময় কেউ বার্মা বা বিদেশ গেলে সমাজে একঘরে করা হত। তার প্রমাণ পেয়েছি আমরা 'শ্রীকান্ত'-এ বিধবা নারীর সৎকারের ঘটনার বিবরণে। সমাজে বিধান ও শাস্ত্র-নির্মাতারা যদি কূপমণ্ডুকের অবস্থান পরিবর্তন করে নিজেকে সামান্যতম প্রসারিত করার সাহস রাখত। তাহলে দেশ-বিদেশের সংস্পর্শে অনেক আগেই উদার স্বচ্ছ দৃষ্টিলাভ করে নিজের অবক্ষয় ঠেকাতে সক্ষম হত। 'শ্রীকান্ত' দ্বিতীয় পর্বে শ্রীকান্ত বার্মায় যে মেসে উঠেছিল সেখানে দেখেছে, হরি মোড়ল (ডোম) জাত গোপন করে আশ্রয় নিয়েছে তার চেয়ে উচ্চশ্রেণির লোকের কাছে। সবাই পরে জানতে পেরেও তাকে কিছু বলেনি। সে অপমানিত বোধ করতে পারে তাই সে কথা কখনও উত্থাপনও করেনি। শ্রীকান্ত উপলব্ধি করেছে —

> ''দেশের অশিক্ষিত ছোটলোক হইয়াও ইহারা একজন অপরিচিত বাঙ্গালীর এতবড় মারাত্মক অপরাধও মাপ করিয়াছে; ..... এ অসম্ভব কি করিয়া সম্ভব হইল! ..... হৃদয়ের কতখানি প্রশস্ততা, মনের কত বড় ঔদার্য ইহার জন্য আবশ্যক। এ যে শুধু তাহাদের দেশ ছাড়িয়া বিদেশে আসার ফল তাহাতে আর সংশয়মাত্র নাই। মনে হইল এই শিক্ষাই এখন আমাদের দেশের জন্য সকলের চেয়ে বেশি প্রয়োজন। ঐ যে নিজের পল্লীটুকুর মধ্যে সারাজীবন বসে কাটানো; মানুষকে সর্ববিষয়ে ছোট করিয়া দিতে এত বড় শত্রু বোধ

করি কোন একটা জাতির আর নাই।"[৫১]

শরৎচন্দ্র বিশ্বাস করতেন নারী পুরুষের সম-অধিকারে। নারী-পুরুষের যৌথ উদ্যোগেই দেশ, সমাজের ক্রমোন্নতি সম্ভব। নারীর বঞ্চনার ফলে অলক্ষ্যে দেশেরই ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। এই সূক্ষ্ম দিকটি শরৎচন্দ্র অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের জীবনসংগ্রামী পথিক শরৎচন্দ্র। পথ চলার বিচিত্র পরিবেশে জীবনে দৈন্য-দুর্দশার মধ্য দিয়েই এই গভীর জ্ঞান লাভ করেছিলেন। নারী বঞ্চনাকে দেশের অহিতের কারণ হিসেবে সূক্ষ্ম চেতনায় উপলব্ধি করেছিলেন। তাই সমাজে শাস্ত্র-বিধানকারীরা যেদিন থেকে নারীকে অন্দরমহলে ঠেলে দিল সেদিন থেকেই মানবের শক্তি দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। নারীও এই সমাজেরই এক অনমনীয় মানবীয় শক্তি। শরৎচন্দ্র 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে শুধু নারীর বঞ্চনার ইতিহাসই তুলে ধরেননি, সূক্ষ্ম মননশীল বিশ্লেষণে ঔপনিবেশিক ইংরেজের কবলে পরাধীনতার এটাও যে একটা গূঢ় কারণ, এটাও বোঝাতে চেয়েছেন। কারণ 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে নারীর বঞ্চনা, নিম্নশ্রেণির নিপীড়নই মূলত প্রকাশ পেয়েছে। ঠিক তেমনি দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বে প্রকাশ পেয়েছে ঔপনিবেশিক ধনতান্ত্রিক, মালিক-জমিদারি শোষণের প্রতিচ্ছবি। শ্রীকান্ত রেঙ্গুন যাত্রাকালে প্রত্যক্ষ করেছে জাহাজের ইংরেজ অফিসার খালাসিদের উপর অকথ্য বর্বরোচিতভাবে লাথি মেরেছে। জাহাজের বাঙালি ডাক্তার এই ঘটনার প্রতিবাদ করেন। বলেন যে কুলিরা জানোয়ার নয় এরা গরীব মানুষ। কিন্তু দুঃখের বিষয় শত শত বৎসরের পরাধীনতায় মানুষের আত্মসম্মানবোধ মরে গেছে। কারণ খালাসিরা দূরে দাঁড়িয়ে এই ঘটনার পর অবাধে হাসছিল। ইংরেজ যে তাদের প্রভু এটা তারা অস্থিমজ্জা দিয়ে মেনে নিয়েছে। তাই ইংরেজের করা অপমান সাদরে গ্রহণ করেছে। কিন্তু স্বদেশি ডাক্তারকে তারা নিজের ক্ষোভ ব্যক্ত করে। শ্রীকান্ত বলেছে —

> ''চাহিয়া দেখি, কয়েকটা উচু পিপার আড়ালে দাঁড়াইয়া লোকগুলো দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছে এবং গায়ের ধূলা ঝাড়িতেছে। ডাক্তার তাদের নির্লজ্জতার কথা বললে, প্রত্যুত্তরে তারা বলেছে— ''তুমি ডাক্তারবাবু ব্যাটা বলবার কে? কারো কর্জ ক'রে খায়ে হাসতেছি মোরা?"[৫২]

ঔপনিবেশিক ইংরেজের হাতে এই নিপীড়িত, লাঞ্ছিত, নিম্নশ্রেণির লোকেরা নিজেদের আত্মসমর্পণ করে দিয়েছে। কারণ নিজ দেশেও তো তারা কোনোকালেই মানুষের মর্যাদাটুকু পায়নি। তাদের কাছে উপনিবেশ এবং দেশ তাই সমার্থক। জমিদারি প্রথাতেও নিম্নশ্রেণির দরিদ্র লোকেরা শোষিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। এই

জমিদারির জাঁতাকলে নিষ্পেষণেরই একটি নমুনা দেখি গঙ্গামাটির কুশারী পরিবারে। কুশারী পরিবারের কর্তা এক দরিদ্র নাপিতের জমিজমা হরণ করেছে। তারপর আরও আর্থিক উন্নতি করে জমিদার হয়েছে। এর ফলে বিধবা তাঁতি বউ ও তার ছোট ছেলে নিজের সম্পত্তি থেকেই বঞ্চিত হয়ে দৈন্যদশায় জীবন যাপন করছে। এই কথাটি জানতে পেরে কুশারীর ভ্রাতৃজায়া সুনন্দা প্রজাস্বার্থে প্রতিবাদী হয়ে স্বামীপুত্র নিয়ে গৃহত্যাগ করেছে। নারী চরিত্র সুনন্দার মধ্য দিয়েই যেন লেখক সমাজের প্রতিবাদী চেতনাকে জাগাতে চেয়েছেন। কারণ দুটি হতে পারে, প্রথমত নারীকে শিক্ষার আলো থেকে দূরে রাখা হয়েছে কিন্তু সুনন্দা শাস্ত্রজ্ঞানে শিক্ষিতা নারী। একজন শিক্ষিতা নারীই দৃঢ় মনোবলে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে সাহসী হয়। তাই দেশে, সমাজে অপশক্তির রোধে নারীশিক্ষা প্রয়োজনীয়। দ্বিতীয়ত নারীর দৃঢ়তা, সততাই পারে অন্যায়ের অপশক্তির মেরুদণ্ড ভাঙতে। যার প্রকাশ ঘটেছে জমিদার ভ্রাতৃজায়া সুনন্দার চরিত্রে।

ঔপনিবেশিক, ধনতান্ত্রিক শোষণের ফলে দেশের মানুষ ইতর প্রাণী রূপে গণ্য হচ্ছে। তারই ছবি দেখি তৃতীয় পর্বে, ট্রাকে কুলি মজুরদের জীবনযাপনের দৃশ্যে ফুটে উঠেছে। শ্রীকান্ত কলেরায় কুলি মজুরদের মৃত্যু, অসহায় অবস্থা দেখেছে। ধনতান্ত্রিক শোষণব্যবস্থার প্রতি তার দরদী মন ক্রুদ্ধ কণ্ঠে অভিসম্পাত দেয়। শ্রীকান্ত বলে মানুষের মরণ তাকে কষ্ট দেয় না, কষ্ট হয় মনুষ্যত্বের মরণে। ধনতান্ত্রিক সভ্যতার প্রতিভুরা ধনলোভে মনুষ্যত্ব হারিয়েছে। শুধু মাটি কাটার জন্য এতগুলো প্রাণকে ট্রাকে অমানবিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত করে তুলেছে। কাজ না করলে মজুরি নেই, তাই তারা মানবহৃদয়ের বৃত্তি হারিয়ে পশুতে পরিণত। নিজের স্বজাতের করুণ মৃত্যুতে একই ট্রাকে থেকেও ফিরে চায় না। তারা একটি কথাই বোঝে — 'শুধু মাটি কাটা, শুধু মজুরি।' শ্রীকান্ত ক্ষোভে, ঘৃণায় ধনতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রতি অভিসম্পাত দেয়। অমানবিক শোষণের স্বরূপটি শরৎচন্দ্র শ্রীকান্তের ভাষ্যে তুলে ধরেছেন—

> ''সভ্যতার অজুহাতে ধনীর ধনলোভ যে কত বড় হৃদয়হীন পশু বানাইয়া তুলিতে পারে, এই দুটা দিনের মধ্যেই যেন এ অভিজ্ঞতা আমার সারা জীবনের জন্য সঞ্চিত হইয়া গেল। ..... সভ্য মানুষে একথা বোধ হয় ভাল করিয়াই বুঝিয়া লইয়াছে, মানুষকে পশু করিয়া লইতে না পারিলে পশুর কাজ আদায় করা যায় না।''[৫৩]

ট্রাকের উপর বসে চারিদিকে কুলি মজুরদের অসহায়, করুণ মৃত্যু এবং অন্যদিকে ধনতান্ত্রিক সভ্যতায়

মানবিকতার মৃত্যু তাকে ব্যথিত করে তুলেছে। তার অন্তরাত্মা তাই এই নিরুপায়দের প্রতি সমবেদনায়, করুণায়, ক্ষোভে যন্ত্রণার অবসান রূপে তাদের মৃত্যু কামনা করেছে। অসহায় এই মানবতার মৃত্যু দেখে ধনতান্ত্রিক শোষণকারীদের প্রতি শোষিতদের প্রতিনিধি হয়ে অভিসম্পাত দিয়েছে —

> ''আধুনিক সভ্যতার বাহন তোরা . . . কিন্তু যে নির্মম সভ্যতা তোদের এমনধারা করিয়াছে তাহাকে তোরা কিছুতেই ক্ষমা করিস না। যদি বহিতেই হয় ইহাকে তোরা দ্রুতবেগে রসাতলে বহিয়া নিয়া যা।''[৫৪]

গঙ্গামাটিতে যাত্রাকালে দেখা যায় সন্ন্যাসী বজ্রানন্দের চোখে ঔপনিবেশিক সমাজব্যবস্থায় দেশের দুর্দশার প্রতিচ্ছবি। সন্ন্যাসীর কাছে যদিও এই দেশ বলতে ছিল পল্লীগ্রামগুলোর কথা। কীভাবে দেশের সমস্ত উৎপাদন প্রলোভন দিয়ে ইংরেজরা বিদেশে নিয়ে যায়। যার ফলে খাদ্যাভাব প্রধান একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। মাতৃভূমির মেদ-মজ্জা-রক্ত বিদেশিরা শোষণ করছে। পল্লীগ্রামের কোনায় কোনায় বিড়ম্বিত জীবনের ছবি এই অল্পবয়সী জনসেবায় ব্রতী সন্ন্যাসীরূপী দেশপ্রেমিকের বিচার-বিশ্লেষণে তুলে ধরেছেন। শ্রীকান্ত সন্ন্যাসী বজ্রানন্দের বিবরণে দেশের মারাত্মক দুরবস্থা সম্পর্কে স্তব্ধ হয়ে বলেছেন —

> ''দেশে জল নাই, প্রাণ নাই, স্বাস্থ্য নাই — জঙ্গলের আবর্জনায় যেথায় মুক্ত আলো ও বায়ু পথরুদ্ধ, যেথায় জ্ঞান নাই, বিদ্যা নাই, ধর্ম বিকৃত, পথভ্রষ্ট মৃতকল্প। .... দেশের এই দৈন্য যে কিরূপ ভয়ঙ্কর দীনতা, আজিকার পূর্বে তাহার ধারণাই যেন আমার ছিল না।''[৫৫]

শরৎচন্দ্র ছিলেন মধ্যবিত্ত অসচ্ছল পরিবারের সদস্য। দেনার দায়ে যার বাড়ি বিক্রি হয়ে গেছে। মামার বাড়িতে পরাশ্রয়ে গ্লানিময় জীবন কাটিয়েছেন। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে দুঃখ-দৈন্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করেছেন। সংগ্রামী জীবনের যিনি অভিন্ন অংশীদার। সাহিত্যে আবির্ভাবের পূর্বে নিম্নশ্রেণির অবজ্ঞার অখ্যাত মানুষের সান্নিধ্য লাভ তাঁকে বাস্তব জ্ঞান, জীবন ও সমাজ সম্পর্কে গভীর অভিজ্ঞতা দিয়েছে। ঔপনিবেশিক, ধনতান্ত্রিক সমাজের অন্তঃস্থলে তিনি অবলোকন করেছেন অবক্ষয়ী মূল্যবোধ। জীবন ক্লেশের অনুভবে, জীবনে দুঃখ কষ্টের মূল্যে যিনি লাভ করেছিলেন এই সত্যমূলক অভিজ্ঞান। তাঁরই গভীর অনুধ্যানে, কলমে ফুটে উঠতে পারে এমন সমাজ আলেখ্য। শরৎচন্দ্র বলেছিলেন —

> ''অভিজ্ঞতা না থাকলে ভাল কিছুই লেখা যায় না। .... বলেছি - ইচ্ছায়

হোক, অনিচ্ছায় হোক আমাকেও চার-পাঁচবার সন্ন্যাসী হতে হয়েছিল।"[৫৬]

শরৎচন্দ্রের এই স্বীকারোক্তির মূলেই বজ্রানন্দ সন্ন্যাসীর জীবনের অভিজ্ঞতা ও দেশমাতৃকার দুরবস্থার প্রতিকৃতি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। শরৎচন্দ্র সমস্ত জীবন ধরে অপমানিত ও অবহেলিত মানুষের কথা অক্লান্তভাবে বলে গেছেন তাঁর রচনায়। দরদী লেখক ছিলেন এই জীবনসংগ্রামের অভিন্ন অংশীদার।

শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাস ব্যাখ্যায় সামগ্রিক বিচারে দেখা যায় তাতে একদিকে শরৎচন্দ্রের আত্মজীবনের বাস্তব উপাদান, অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি নিহিত। অন্যদিকে সাহিত্যিক মননের পরিকল্পনায়, ভাবরস ও নান্দনিক বিশিষ্টতার ক্রিয়া-প্রক্রিয়ায় ঔপন্যাসিক ধর্ম। ব্যক্তি শরৎ ও শিল্পী শরৎচন্দ্রের সাযুজ্যে জীবনসত্যের মূল্যবোধে একটি অনবদ্য রচনা সৃষ্টি হয়েছে। এখানে একদিকে আছে শরৎচন্দ্রের আশৈশব আত্মজীবনের বিশেষ বিশেষ মুহূর্ত অন্যদিকে অন্তর্দৃষ্টি ও সাহিত্যিক অভিনবতার বিশিষ্টতা। বিশেষত একজন অনুসন্ধিৎসু মানবের বিস্তৃত জীবনব্যাপী প্রত্যক্ষ বাস্তব ও অভিজ্ঞতার সামঞ্জস্যে জীবনসত্যের আধারে আহরিত জীবনবোধ। এখানে যে সত্য উদ্ভাসিত হয়েছে তা লেখকের একান্ত আত্মবীক্ষণে উপলব্ধ জীবনদর্শন।

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের রচনাশৈলী আত্মজীবনীর শৈলীকেই ধারণ করেছে। কিন্তু এখানে কথক বা কেন্দ্রীয় চরিত্রটি লেখকের বাস্তব ও কল্পনার শিল্পিত মানসচরিত্র। এই মুখ্য চরিত্র বিস্তৃত জীবনের স্মৃত-বিস্মৃত ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছে। কিন্তু সে এই রচনায় নিজেকে একজন দ্রষ্টারূপে বা অন্যান্য চরিত্রের সহযোগী সত্তারূপেই উপস্থাপন করেছে। তারই জীবনের সমান্তরালতায় অন্যান্য ছোট বড় চরিত্রগুলি নিজের নিজের জীবন সংঘাত নিয়ে স্পষ্টরূপে উদ্ভাসিত হয়েছে। এখানেই একটি মুখ্য চরিত্রের চারপাশে অপর সত্তাগুলির সক্রিয় উপস্থিতিতে উপন্যাসের 'দ্বিবাচনিক সত্য' রক্ষিত হয়েছে। সত্তা এককভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, অপর সত্তার উপস্থিতিতেই সে নিজেকে সম্পূর্ণতা দেয়। বাখতিন কথিত উপন্যাস ধর্মের এই শর্তটি লেখকের লিখনী প্রক্রিয়ায় সুনিপুণভাবে পূর্ণতা পেয়েছে। সেটা আসলে Novelisation-এর প্রাক্‌শর্ত জীবন ও শিল্পের মেলবন্ধনের প্রক্রিয়া।

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের বৃত্তাকার পরিমণ্ডলে অসংখ্য চরিত্র রয়েছে। যাদের সংঘাত, সুখ-দুঃখ মিশ্রিত জীবন-কাহিনির অন্তরালে উদ্ভাসিত হয়েছে সমাজের অন্যায় অবিচার। লেখক বিভিন্ন পরিবেশ, পরিস্থিতি ও সমাজের অন্যায়, অবিচারের স্বরূপ চিহ্নায়িত করেছেন। এইসব বিক্ষিপ্ত, ছড়ানো ছিটানো চরিত্রগুলোর

সামগ্রিক রূপচিত্র অঙ্কনের মাধ্যমে। লেখক বিস্তৃত সময়-পরিসরে বিভিন্ন, বিক্ষিপ্ত চরিত্রগুলো ঔপন্যাসিক বৃত্তাকার পরিমণ্ডলে একসূত্রে গেঁথেছেন তাঁর মুখ্য মানস চরিত্রটির ভবঘুরে জীবন পরিক্রমার মাধ্যমে। জীবনে ভবঘুরে ভাবে চলতে চলতে সে তাদের সান্নিধ্যে এসেছে। গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও জীবনবোধ দিয়ে তাদের জগৎ ও জীবন নিরূপণ করেছে। এখানে তাই শুধুমাত্র শ্রীকান্তের একক অভিজ্ঞতার আত্মস্বরই নয়। বরং সামাজিক সংঘাতে, জীবন-যন্ত্রণায় বিহ্বল অসংখ্য মানব-মানবীর স্বরও উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। উপন্যাসীকরণ প্রক্রিয়ার মূল ভাববীজ সামাজিক বহুস্বরিকতার (Social Heteroglossia) চিহ্নায়নের দিকটিও লেখকের সুনিপুণ ভাববিশ্লেষণে এবং রচনার পরিকাঠামোয় (structure) উঠে এসেছে। ছড়ানো ছিটানো একক অন্বয়গুলোকে সমবেত ভাবে সমন্বিত করে লেখক সামগ্রিক একটি সামাজিক রূপচিত্র অঙ্কন করেছেন। যা বহুখণ্ডযুক্ত (Multivolumed) উপন্যাসের প্রধান ধর্ম।

উপন্যাসীকরণ প্রক্রিয়ায় চরিত্রের বিকাশ একটি মুখ্য শর্ত। শরৎচন্দ্র গল্প, উপন্যাসে প্লট অপেক্ষা চরিত্রের বিকাশে জোর দিতেন। তাঁর ধারণা ছিল চরিত্রের গতি ঠিকঠাক এগোলেই সজীব প্রাণবন্ত হয়ে উঠলেই প্লট আপনা-আপনিই এসে যায়। তাই বাস্তব জীবন উপাদানের আধারে রচিত 'শ্রীকান্ত'-এ একজন ভবঘুরে মহাপ্রাণের জীবনে পথ চলার বাঁকে বাঁকেই বৃত্তাকার পরিমণ্ডল গঠিত হয়েছে। শিল্পী শরৎচন্দ্র চরিত্র চিত্রণে নারী পুরুষের ভাল-মন্দের চিরাচরিত ভাবনাটি হৃদয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতি দিয়ে অন্য পথে চালিত করেছেন। তাঁর দরদী শিল্পী হৃদয়ের নিবিড় অনুভূতি সমস্ত হীনতা, দৈন্যতা ও তুচ্ছতাকে রসসিক্ত করে তুলেছে। মানুষের নীচতা ও মহত্বের দিকগুলি তিনি জীবনে বহু দুঃখকষ্টের মূল্যে প্রত্যক্ষ করেছেন। জীবনযন্ত্রণার দুঃখদৈন্যে ভরা তীব্র দাহকে উপলব্ধি করেছিলেন। মানব জীবনের নীচতার অন্তরালে শরৎচন্দ্রের দরদী মন মহত্বের সন্ধান পেয়েছিলেন। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে দেখা যায় সমাজবিধি বহির্ভূত প্রেমের প্রকাশ। চরিত্রগুলি সমাজে কলুষিত কিন্তু শরৎচন্দ্রের অন্তর্দৃষ্টির গভীর অনুভূতি ও সাহিত্যিক অভিনবতায় এরা পরার্থপরতা ও ত্যাগের মধ্য দিয়ে দীপ্ত এবং মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে। মানুষের জীবন ও প্রেম ঘটনার আবর্তে অনেক সময়ই স্বাভাবিক ছন্দে চলে না। প্রেমের অবৈধ গতি ও জীবনে আরোপিত কলঙ্ক মানব মনের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যটুকু নষ্ট করে দেয় না। তাঁর সাহিত্যিক অভিনবতার বিশিষ্টতা হল তিনি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে পঙ্কিল কলুষিত স্থানেও সততা ও মনুষ্যত্বের আলোকবর্তিকা প্রজ্বলন করেন। শরৎচন্দ্র বলেছিলেন —

> ‘‘বাস্তব অভিজ্ঞতাকে আমি উপেক্ষা করি না। কিন্তু বাস্তব ও অবাস্তবের সংমিশ্রণের কত ব্যথা, কত সহানুভূতি, কত পরিমাণে বুক থেকে নিংড়ে, ধীরে ধীরে প্রসারিত হয়ে সজীব রূপ নিয়ে এরা দণ্ডায়মান হয় সে কথা আর কেউ জানে না, — কেবল আমিই জানি।’’[৫৭]

এই হল শরৎচন্দ্রের চরিত্র সৃষ্টির মূল কথাটি। শ্রীকান্ত উপন্যাস তাই শরৎচন্দ্রের বাস্তব জীবন অভিজ্ঞতা, আত্মজীবনের উপাদান অবাস্তবের নতুন সংযোজনের সংমিশ্রণে প্রসারিত হয়েছে। যার ফলে আত্মজীবনীর সত্যের স্বরূপ বাস্তবকে অতিক্রম করে কল্পনার সাযুজ্যে শিল্পের সত্যে রূপান্তরিত হয়েছে। উপন্যাসের চিত্রিত লেখকের প্রতিসত্তা শ্রীকান্তের অন্তরালে শরৎচন্দ্র বলেছেন, যেভাবে বলছেন ঠিক তেমনি হয়তো ঘটেনি। রাজলক্ষ্মী, অন্নদাদিদি, কমললতা, অভয়া এই মুখ্য নারীচরিত্রগুলি লেখকের সহানুভূতি এবং বাস্তব ও অবাস্তবের সংমিশ্রণেই সজীব ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। অজিত কুমার ঘোষ যথার্থই বলেছেন—

> ‘‘শ্রীকান্ত শরৎচন্দ্রের জীবন কাহিনী নহে, উপন্যাস। সেজন্য ইহাতে বাস্তবের সহিত কল্পনা, সত্যের সহিত মিথ্যা, তথ্যের সহিত সৌন্দর্য ও রসের মিলন ঘটিয়াছে। বাস্তব শরৎচন্দ্র খণ্ড, অসম্পূর্ণ ও অসমঞ্জস, কিন্তু উপন্যাসের নায়ক শ্রীকান্ত অখণ্ড, পরিপূর্ণ ও সুসমঞ্জস। শ্রীকান্ত শরৎচন্দ্রকে ব্যক্ত করিয়াছে যেমন, প্রচ্ছন্নও রাখিয়াছে তেমনি।’’[৫৮]

শ্রীকান্তে শরৎচন্দ্রের প্রত্যক্ষ বাস্তবের ঘটনার কিছুটা উপাদান গৃহীত হয়েছে। জীবনের বাহুল্য ঘটনাকে তিনি বর্জন করেছেন। চরিত্র ও পরিবেশকে রসোত্তীর্ণ করতে কিছু চরিত্রের সংযোজন ঘটেছে। ঘটনার বিস্তার ও ধারাবাহিকতা রক্ষায় পরিমার্জনের দ্বারা উপন্যাসকে পরিশীলিত রূপ প্রদান করতে হয়েছে শিল্পীকে। এভাবে ‘শ্রীকান্ত’ উপন্যাসটি শরৎচন্দ্রের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় বাস্তবের সঙ্গে তাঁর দরদী সাহিত্যিক মনটির লেখনী শক্তির জাদুবলে প্রকাশ পেয়েছে গভীর মানবতাবোধ, জীবনদর্শন। লেখকের মনোজগতের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে ‘শ্রীকান্ত’ উপন্যাসটি মহিমান্বিত। তিনি একজন সমাজ-সচেতন শিল্পী। খুব স্বাভাবিকভাবেই সমাজের ভাল-মন্দ মিশ্রিত অবস্থা এবং পরিণামের বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। সাহিত্যে শরৎচন্দ্র যেভাবে জীবনকে চিত্রিত করেছেন। গভীর আত্মবীক্ষণ ও দর্শনে জাতিভেদ, সমাজ-সংস্কার, নারীর কলঙ্ক সম্পর্কে ধারণা ব্যক্ত করেছেন। তাতে ঔপন্যাসিকের সূক্ষ্ম সমাজতাত্ত্বিকের উদাত্ত মানবিকতাবোধ উজ্জ্বল হয়ে

ফুটে উঠেছে। যেমন সামাজিক অন্যায়, অনাচারের বিরুদ্ধে আঘাত হেনেছেন তিনি। ঠিক তেমনি সমাজের নিষ্পেষিত নর-নারীর অন্ত্যজ শ্রেণির দুরবস্থা যে সামাজিক বিধি-নিষেধের ফলেই হয় — এই গভীর সত্যটুকুই তুলে ধরলেন শ্রীকান্তের বঞ্চিত, কলুষিত নর-নারীর চরিত্রের মাধ্যমে। তার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন নতুন নৈতিক মূল্যবোধের।

'শ্রীকান্ত' শরৎচন্দ্রের সুখ-দুঃখ, হয়ে ওঠা, ভ্রমণের জীবনবৃত্তান্ত নয়। আসলে 'শ্রীকান্ত' শরৎচন্দ্রের জীবন পরিক্রমার পর্যবেক্ষণমূলক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপ্তি। এখানে জীবনে আহরিত বাস্তব সত্য, বাস্তব থেকে নিঙড়ে নেওয়া অভিজ্ঞতা ও জীবনসত্যের উপলব্ধির সমন্বয় ঘটেছে। এটা আসলে শৈশব থেকে বিস্তৃত জীবন পরিক্রমায় সমগ্র জাতি, সমাজ নির্বিশেষে বিভিন্ন কাল, পরিসর, পরিস্থিতির দর্পণ। সচেতন সমাজ পর্যবেক্ষকের আত্মচিন্তা, আত্মদর্শন ও জীবনসত্যের সমন্বয়ে অর্জিত সূক্ষ্ম একজন সমাজতাত্ত্বিকের আত্মবিশ্বাসের প্রতিবেদন। কারণ শরৎচন্দ্র জীবনে, সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা পালন করেছেন সাহিত্যের মাধ্যমেই। তাই শ্রীকান্ত তথ্য, বিবরণ ও জীবনের সত্যের সমারোহে প্রস্তুত আত্মজীবনী বা আত্মকাহিনি নয়। এটা আসলে একজন সমাজতাত্ত্বিকের আত্মজীবন দিয়ে অর্জিত বিশ্বাস, সত্য ও নৈতিকতাবোধে সমাজ পর্যবেক্ষণমূলক জীবনদৃষ্টির উপন্যাসায়ন।

তথ্যসূত্র :

১। কমলকুমার সান্যাল (সম্পাদিত), উপন্যাস বীক্ষা, বাংলা উপন্যাস ও ঔপন্যাসিক, পপুলার লাইব্রেরী, কলকাতা-৭৩, ১৯৮৪, পৃঃ ১৬

২। সুধীর চক্রবর্তী (সম্পাদিত), বুদ্ধিজীবীর নোটবই, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯, ২০০৫, পৃঃ ২৩৫

৩। তদেব, পৃঃ ২৩৬

৪। তদেব, পৃঃ ২৩৬

৫। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুলভ শরৎ সমগ্র/ ১ম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-৯, ১৯৯৫, পৃঃ ২৬৮

৬। উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত, ঘোষ এণ্ড কোং, কলকাতা-৯, ২০০৫, পৃঃ ১৪

৭। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুলভ শরৎ সমগ্র/ ১ম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-৯, ১৯৯৫, পৃঃ ২৬৮

৮। মোহিতলাল মজুমদার, শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৯, ২০০৮, পৃঃ ৬, ৭

৯। ভবেশ মজুমদার, শ্রীকান্ত চর্চা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-৯, ২০০৬, পৃঃ ২৭

১০। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুলভ শরৎ সমগ্র/ ১ম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-৯, ১৯৯৫, পৃঃ ২৯৭

১১। মোহিতলাল মজুমদার, শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৯, ২০০৮, পৃঃ ১০

১২। ড. অজিতকুমার ঘোষ, শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্যবিচার, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, ২০০৭, পৃঃ ১৪৪

১৩। তদেব, পৃঃ ১৪৪

১৪। তদেব, পৃঃ ১৪৫

১৫। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুলভ শরৎ সমগ্র/ ১ম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-৯, ১৯৯৫, পৃঃ ২৬৮

১৬। ড. অজিতকুমার ঘোষ, শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্যবিচার, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, ২০০৭, পৃঃ ১৪৪

১৭। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুলভ শরৎ সমগ্র/ ১ম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-৯, ১৯৯৫, পৃঃ ৩৮০

১৮। ড. অজিতকুমার ঘোষ, শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্যবিচার, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, ২০০৭, পৃঃ ১৪৭

১৯। পরিমল রায় (সম্পাদিত), শরৎচন্দ্র : স্মরণ-নিরীক্ষণ, আজকের ধূমকেতু, কলকাতা-৩৬, ১৪১৯, পৃঃ ১৯৯-২০০

২০। বাজে শিবপুর থেকে ২৪ জুলাই, ১৯১৯ সালে লীলারানী গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা চিঠির অংশ :– শরৎচন্দ্র : স্মরণ-নিরীক্ষণ, পৃঃ ১৯৮ থেকে উদ্ধৃত।

২১। পরিমল রায় (সম্পাদিত), শরৎচন্দ্র : স্মরণ-নিরীক্ষণ, আজকের ধূমকেতু, কলকাতা-৩৬, ১৪১৯, পৃঃ ১৯৫

২২। তদেব, পৃঃ ২০০

২৩। তদেব, পৃঃ ১৯৮

২৪। তদেব, পৃঃ ১৩৪

২৫। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুলভ শরৎ সমগ্র/ ১ম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-৯, ১৯৯৫, পৃঃ ২৬৮

২৬। তদেব, পৃঃ ২৬৮

২৭। তদেব, পৃঃ ২৬৯

২৮। তদেব, পৃঃ ২৭৫

২৯। তদেব, পৃঃ ২৭৯

৩০। তদেব, পৃঃ ২৭৯

৩১। তদেব, পৃঃ ২৭৯

৩২। তদেব, পৃঃ ২৮০

৩৩। তদেব, পৃঃ ২৭৫

৩৪। তদেব, পৃঃ ২৭৫

৩৫। তদেব, পৃঃ ২৯১

৩৬। তদেব, পৃঃ ২৯৩

৩৭। তদেব, পৃঃ ২৯৩

৩৮। তদেব, পৃঃ ৩৫৯

৩৯। তদেব, পৃঃ ৩৫৯

৪০। তদেব, পৃঃ ৩৬০

৪১। তদেব, পৃঃ ৩৬০

৪২। তদেব, পৃঃ ৩০১

৪৩। তদেব, পৃঃ ৩১৬

৪৪। তদেব, পৃঃ ৪৭০

৪৫। তদেব, পৃঃ ৩৫৯

৪৬। তদেব, পৃঃ ৪০৯

৪৭। তদেব, পৃঃ ৪১০

৪৮। পরিমল রায় (সম্পাদিত), শরৎচন্দ্র : স্মরণ-নিরীক্ষণ, আজকের ধূমকেতু, কলকাতা-৩৬, ১৪১৯, পৃঃ ২৫৪

৪৯। তদেব, পৃঃ ৩৮, ৩৯, ৪১

৫০। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুলভ শরৎ সমগ্র/ ১ম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-৯, ১৯৯৫, পৃঃ ৩৭৭

৫১। তদেব, পৃঃ ৩৪৬

৫২। তদেব, পৃঃ ৩৪১

৫৩। তদেব, পৃঃ ৪২৮

৫৪। তদেব, পৃঃ ৪২৯

৫৫। তদেব, পৃঃ ৩৯৫

৫৬। পরিমল রায় (সম্পাদিত), শরৎচন্দ্র : স্মরণ-নিরীক্ষণ, আজকের ধূমকেতু, কলকাতা-৩৬, ১৪১৯, পৃঃ ২৯৭

৫৭। পরিমল রায় (সম্পাদিত), শরৎচন্দ্র : স্মরণ-নিরীক্ষণ, আজকের ধূমকেতু, কলকাতা-৩৬, ১৪১৯, পৃঃ ১২২

৫৮। ড. অজিতকুমার ঘোষ, শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্যবিচার, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, ২০০৭, পৃঃ ১৪৬